Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

আমি পদ্মজা - ৪১

সূর্যমামার ঘুম ভাঙতে তখনো বাকি। তবে তার আগেই ডাকাডাকি করে সবার ঘুম ভাঙানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে পাখিরা। পদ্মজা স্বামীর বুকের ওম ঝেড়ে ফেলে অজু করে আসে। এসে দেখে তার সোহাগের স্বামী এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পদ্মজা ডেকে তুলে, একসাথে ফজরের নামায আদায় করে। নামায শেষ করেই আমির ঘুমিয়ে পড়ে। পদ্মজা রান্নাঘরে যায়। গিয়ে দেখে,ফরিনা বেগম এখনও আসেননি। আজ মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল। উত্তেজনায় পদ্মজার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সে পায়চারি করতে করতে লাবণ্যর ঘরের সামনে আসে। দরজা খোলা। পদ্মজা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, রানি মাটিতে বসে আছে। উদাস হয়ে কিছু ভাবছে। রাতে ঘুমায় না। নিজের মতো জগত করে নিয়েছে। খাবার রেখে যাওয়া হয়,যখন ইচ্ছে হয় খায়। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এরপর জায়গা ত্যাগ করল। রানি অন্য কাউকে দেখলে খুব রেগে যায়। তাই এই ভোরবেলা তার সামনে না যাওয়াই মঙ্গল। পদ্মজা সদর ঘরে পায়চারি করতে থাকল। ফরিনা বেগম তাসবিহ পড়তে পড়তে সদর ঘরে প্রবেশ করেন। পদ্মজাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'উইট্টা পড়ছ তুমি! চুলায় আগুন ধরাইছো?'

পদ্মজা অপরাধীর মতো মাথা নত করে 'না' উচ্চারণ করল। ফরিনা এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না। মৃদু কণ্ঠে আদেশ করলেন, 'লাবণ্যরে ডাইককা তুলো গিয়া। ছেড়িডা আইজও মানুষ হইলো না। ভোরের আলো ফুইটা গেছে। হে এহনও ঘুমায়।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

পদ্মজা আবার লাবণ্যর ঘরের সামনে আসল। এবার আর বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে চলে যায়নি। ভেতরে ঢুকল। পদ্মজা আওয়াজ করে দরজা খুলে। তাও রানির ভাবান্তর হলো না। সে যেভাবে মাটিতে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল,সেভাবেই রয়েছে। পদ্মজা রানির দিকে চেয়ে চেয়ে পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর লাবণ্যকে ডাকল, 'এই লাবণ্য। লাবণ্য?'

লাবণ্য আড়মোড়া ভেঙে ঘুমু ঘুমু চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, 'উ?'

'আজ ফলাফল। আর তুই ঘুমাচ্ছিস।'

পদ্মজার কথা বুঝতে লাবণ্যর অনেক সময় লাগল। যখন বুঝতে পারল লাফিয়ে উঠে বসল। বুকে হাত রেখে, হাসঁফাঁস করতে করতে বলল, 'কী বললি এটা! দেখ কলিজাডা লাফাইতাছে। কী ভয়ানক কথা মনে করায়া দিলি, উফ!'

পদ্মজা হাসল। বলল, 'কলিজা লাফায় না,বুক ধুকপুক করে।'

'হ,ওইটাই...ওইটাই। আমি ফেইল করব। রানি আপার মতো মাইর খাব দেখিস। আমার শ্বাস কষ্ট হইতাছে।' লাবণ্য ভয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সে আতঙ্কে আছে। এই চিন্তায় রাতে ঘুম আসেনি। ঘুমাতে ঘুমাতে

মাঝরাত হয়ে গেছে। পদ্মজা লাবণ্যর ছটফটানি দেখে ভয় পেয়ে যায়। স্বান্তনা দিয়ে বলল, 'এমন কিছুই হবে না, দেখিস। বেহুদা চিন্তা করছিস। সূর্য উঠে যাবে। নামায পড় জলদি। আল্লাহর কাছে দোয়া কর।'

লাবণ্য হুড়মুড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে,কলপাড়ে ছুটে যায়। এইবার পদ্মজা হেসে ফেলল। রানির দিকে চোখ পড়তেই হাসিটা মিলিয়ে যায়। রানি কাঁদছে। পদ্মজা দুই পা রানির দিকে এগিয়ে আবার পিছিয়ে যায়।

আবার এগিয়ে যায়। রানির পাশে বসে ডাকল, 'আপা?'

রানি চোখ ভর্তি অশ্রু নিয়ে তাকায়। পৃথিবীর সব কষ্টরা বুঝি এক জোট হয়ে রানির চোখে ভীড় জমিয়েছে। রানি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'প্রিয় মানুষ হারানোর কষ্ট এতোডা যন্ত্রনা কেন দেয় পদ্মজা? তুমি তো অনেক জ্ঞানী। সবাই তোমারে বুদ্ধিমতী কয়। তুমি একটা বুদ্ধি দেও না। এই কষ্টের পাহাড় কমানোর বুদ্ধি। আমারে দেখায়া দিবা শান্তির পথ?'

মানুষের কতটা কষ্ট হলে এভাবে শান্তি খুঁজে? পদ্মজার চোখ টলমটল করে উঠে। সে ঢোক গিলে বলল, 'পুরনো স্মৃতি মুছে সামনের কথা ভাবো। নামায পড়ো, হাদিস পড়ো,কোরআন পড়ো। একদিন ঠিক শান্তি খুঁজে পাবা।'

'আমার মতো পাপীরে আল্লাহ কবুল করব?'

'আল্লাহ তায়ালার মতো দয়াবান, উদার আর কেউ নেই। পাপ মুছার জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেজদা দিয়েই দেখো না আপা। ক্ষমা চেয়ে দেখো। আল্লাহ ঠিক তোমার জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। সেদিন বুঝবে,আল্লাহ তোমার সেজদা কবুল করেছেন।'

রানি জানালার বাইরে তাকায়। আমগাছের ডালে চোখ রেখে বলল, 'কেন এমনডা হইলো আমার সাথে?'

"ব্যভিচার করেছো আপা। বিয়ের আগে এভাবে...! আপা এসব ভেবো না আর। যা হওয়ার হয়েছে।'

'দুনিয়াত আর চাওনের বা পাওনের কিচ্ছু নাই আমার।'

'আখিরাতের জন্য সম্পদ জমাও এবার।'

রানি অন্যরকম দৃষ্টি নিয়ে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজা মাথায় সোজা সিঁথি করে সবসময়। এক অংশ সিঁথি দেখা যাচ্ছে। বাকিটুকু শাড়ির আঁচলে ঢাকা। মেয়েটা এত স্নিগ্ধ, এতো সুন্দর, এতো পবিত্র দেখতে! দেখলেই মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পদ্মজা বলল,'আখিরাতের সম্পদ এবাদত, খাঁটি এবাদত।'

'তুমি খুব ভালো পদ্মজা।' রানি মৃদু হেসে বলল। তার চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। বলল,'এখন নামায আদায় করতে পারবে? তাহলে পড়ে নেও।'

' ওইদিনডার পর আর গোসল করি নাই।'

'আজ করবে কিন্তু।'

'করব।'

kobitor.com

'আসি?'

'আসো।'

পদ্মজা বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে পা রাখতেই রানির কান্নার স্বর কানে আসে। পদ্মজা থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে একবার রানিকে দেখে। রানি হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। পদ্মজা মনে মনে প্রার্থনা করে, 'আল্লাহ,ক্ষমা করে দাও রানি আপাকে। শান্তির পথে ফিরে আসার রহমত দাও।'

____

বাড়ির সবাই মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমির সেই সকাল দশটায় বের হয়েছে। এখন বাজে,দুপুর তিনটা। লাবণ্য মিনিটে মিনিটে গ্লাস ভরে পানি খাচ্ছে। আর বার বার টয়লেটে যাচ্ছে। পদ্মজা ঝিম মেরে বসে আছে। হেমলতা সবসময় পদ্মজাকে বলতেন, মেট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার জন্য। পদ্মজার একবার মনে হচ্ছে সে ফার্স্ট ডিভিশন ফলাফল করবে। আরেকবার মনে হচ্ছে, সেকেন্ড ডিভিশনে চলে যাবে। সে এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের তালু চুলকাচ্ছে। এই মুহূর্তে মাকে খুব মনে পড়ছে। কতদিন হলো,দেখা হয় না। প্রথম প্রথম মায়ের জন্য প্রায় কাঁদতো সে। এখন অবশ্য মানিয়ে নিয়েছে। আছরের আযান পড়ছে। এখনও ফিরেনি আমির। পদ্মজা নামায পড়তে চলে যায়। নামায পড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এরপর যা দেখল, খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। আমিরের সাথে হেমলতা, পূর্ণা এসেছে। দুজনের পরনে কালো বোরখা। তিনজন আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে আসছে। মাথার উপর কড়া রোদ নিয়ে মরুভূমিতে সারাদিন হাঁটার পর পথিক তৃষ্ণার্ত হয়ে পানির দেখা পেলে যেমন আনন্দ হয়,ঠিক তেমন আনন্দ হচ্ছে পদ্মজার। ইচ্ছে হচ্ছে দুই তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যেতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। পদ্মজা উন্মাদের মতো দৌড়াতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় উল্টে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। তবুও দৌড় থামল না। সদর ঘরের সবাইকে তোয়াক্কা না করে বাড়ির বউ ছুটে বেরিয়ে যায়। হেমলতা কিছু বুঝে উঠার আগেই তার নয়নের মণি ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। পদ্মজার ছোঁয়ায় চারিদিকে যেন বসন্ত শুরু হয়। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে, ফোঁপাতে থাকল। পদ্মজা হেমলতার বুকে মাথা রেখে পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'এতদিনে আসতে মনে হয়েছে তোমাদের? এভাবে পর করে দিলে আম্মা? আর পূর্ণা,তুইতো আসতে পারিস। বোনকে মনে পড়ে না?'

শাড়ির আঁচল টেনে পদ্মজার মাথার চুল ঢেকে দিলেন হেমলতা। এরপর বললেন, 'মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আসা কী এতই সোজা?'

'তাহলে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর কী দরকার? যদি মা-বাবা সহজে না আসতে পারে।'

'আপা..আমার তোমাকে খুব মনে পড়ে।' পূর্ণা বাচ্চাদের মতো করে কাঁদছে। পদ্মজা পূর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, 'আমারও মনে পড়ে।'

Kobitor.com

হেমলতা পদ্মজার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, '৭৫০ মার্ক পেয়েছিস। স্টার মার্ক। ফার্স্ট ডিভিশন। এই খুশিতে আর কাঁদিস না।'

পদ্মজার চোখভর্তি জল। গাল,ঠোঁট চোখের জলে ভেজা। এমতাবস্থায় হাসল। তাকে মায়াবী ভোরের শিশিরের মতো দেখায়। হেমলতা অন্দরমহলের সদর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন, হাওলাদার বাড়ির বাকিরা তাকিয়ে আছে। তিনি পদ্মজাকে সরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসেন। ফরিনা বেগমের মুখ দেখে পদ্মজার ভয় হচ্ছে। উনার মুখ আগে আগে ছুটে। আম্মাকে কিছু বলবেন না তো?

হেমলতা সবাইকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আমির ধরে নিয়ে আসলো।'

মজিদ হাওলাদার বিনীত স্বরে বললেন, 'এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আজ আসবেন আগে জানলে, গরু জবাই করে রাখতাম।'

হেমলতা হাসলেন। বললেন, 'বলেছেন, এই অনেক।'

'বললেই হবে না। করতে হবে। কয়দিন কিন্তু থেকে যাবেন।'

'এটা বলবেন না। আজই ফিরতে হবে আমার। কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাব।'

'প্রথম বার আসলেন আর কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাবেন?'

'আবার আসব। অনেকদিন থেকে যাবো।'

'আজকের রাতটা থেকে যান।'

'আম্মা আজ থেকে যাও,আমার সাথে।' পদ্মজা অনুরোধ করে বলল।

হেমলতা হাসলেন। ফরিনা কিছু বলছেন না। ভ্রুকুটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হেমলতাকে ভেতরে ভেতরে ভয় পান। কেমন ধারালো চোখের দৃষ্টি। যেন, একবার তাকিয়েই ভেতরের সব দেখে ফেলতে পারে। আর চোখমুখের ভাব দেখলে মনে হয়, কোন দেশের রাজরানি। তার উপর আমির দরদ দেখিয়ে শ্বাশুড়ি নিয়ে এসেছে। ফরিনা বিরক্ত হচ্ছেন। হেমলতা ফরিনার দিকে তাকাতেই ফরিনা চোখ সরিয়ে নেন। হেমলতা ফরিনাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপা,কথা বলছেন না যে? আমার উপস্থিতি বিরক্ত করেছে খুব?'

হেমলতার কথার ফরিনা সহ উপস্থিত সবাই অস্বস্তিতে পড়ে যায়। ফরিনা হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'কী বলছেন আপা? বিরক্ত হইতাম কেরে? এই পরথম আইছেন। খুশিই হইছি।'

'তাই বলুন।'

' দরজায় দাঁড়ায়া গপ আর কতক্ষণ হইবো। ঘরে আহেন।' ফরিনা দ্রুত সটকে পড়েন। সদর ঘরে আগে আগে হেঁটে আসেন। হাঁপাতে থাকেন। বিড়বিড় করেন, 'মহিলা এত্ত চালাক। সত্যি সত্যি সব বুইঝা ফেলে।'

Kobitor.com

হেমলতা সবার আড়ালে শাড়ির আঁচল মুখে চেপে সেকেন্ড দুয়েক হাসলেন। হেমলতাকে হাসতে দেখে, পদ্মজাও হাসল। সবাই সদর ঘরে এসে বসে। লাবণ্য ও পদ্মজার ফলাফল দেওয়ার উপলক্ষে শিরিন,শাহানাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তারা এখন হাওলাদার বাড়িতেই আছে। দুই বোন হেমলতা,পূর্ণার জন্য নাস্তা তৈরি করতে রান্নাঘরে গেল। লাবণ্য দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। আমির এখনও লাবণ্যর ফলাফল কাউকে বলেনি। সে সদর ঘর থেকে লাবণ্যকে ডাকল, 'লাবণ্য? এই লাবণ্য? শুনছিস? এদিকে আয়। আজ তোর খবর আছে।'

আমিরের কথা শুনে লাবণ্যর বুকের ধুকপুকানি থেমে যায়। এখুনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে অবস্থা। নিশ্চিত ফেইল করেছে! লাবণ্য চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকে,কখন সে মারা যাবে। আমির আবার ডাকল, 'বেরিয়ে আয় বলছি। নয়তো দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকব। তখন কিন্তু গায়ে মার বেশি পড়বে।'

লাবণ্য তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নামে। গায়ের ওড়না ঠিক করে দরজা খুলে। সদর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নামাযের সব সূরা পড়তে থাকে।

আমির চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই লাবণ্য কেঁপে উঠে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আগামী বছর মেট্রিকে পাশ করাম, কসম!'

'এই বছরই তো পাশ করেছিস! তাহলে আগামী বছর আবার মেট্রিক দিবি কেন?'

লাবণ্য চকিতে তাকাল। তার মুখটা হা হয়ে যায়। লাবণ্যর মুখের ভঙ্গি দেখে সবাই হাসল। লাবণ্য খুশিতে কেঁদে দিল। আমির লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে,মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,'আরেকটুর জন্য ফেইল করিসনি।'

লাবণ্য হাসতে হাসতে কাঁদছে। লাবণ্যর পাগলামি দেখে আমিরও হাসছে। তখন সদর ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান হাওলাদার। হেমলতা রিদওয়ানের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকান। হেমলতার চোখে চোখ পড়তেই রিদওয়ান বিব্রত হয়ে উঠে। চোখ সরিয়ে নেয়। একটু পর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে,হেমলতা তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। রিদওয়ান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এ যেন সাপুড়ে ও সাপের খেলা।

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

Kobitor.com

____

রাতের খাবার শেষ হয়েছে সবেমাত্র। এশার আযান পড়েছে অনেক আগে। পূর্ণা পদ্মজা ও লাবণ্যকে পেয়ে পুলকিত। আনন্দ বয়ে যাচ্ছে মনে। একটু পর পর উচ্চস্বরে হাসছে। হেমলতা একবার ভাবলেন নিষেধ করবেন,এতো জোরে হাসার জন্য। এরপর কী ভেবে আর নিষেধ করলেন না। তিনি বাড়ির বড়দের সাথে কথা বলছেন। আমির সবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বলল, 'আমার একটা কথা ছিল।'

সবাই আমিরের দিকে তাকাল। আমির নির্দ্বিধায় বলল,'আগামীকাল ফিরব আমি।'

হেমলতা বললেন,

'ঢাকায়?'

'জি। পদ্মজাকে নিয়েই যাব। সাথে লাবণ্যও যাবে। দুজনকে কলেজে ভর্তি করে দেব।'

লাবণ্য পূর্ণার পাশ থেকে উঠে এসে,আমিরের পাশে দাঁড়াল। আবদার করে বলল, 'দাভাই,তুমি কইছিলা আমি পাশ করলে,আমারে দেশের বাইরে পড়তে পাঠাইবা।'

'ছেড়ি মানুষ বাইরে যাইতি কেন? কইলজাডা বড় হইয়া গেছে?' রেগে বললেন ফরিনা।

লাবণ্য মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে আমিরকে বলল,'কথা রাখতে হইবো তোমার।'

আমিরে একবার মজিদকে দেখল। এরপর লাবণ্যকে বলল,'সত্যি যেতে চাস?'

'হ।'

লাবণ্যর মাথায় গাট্টা মারল আমির। এরপর বলল, 'আগে শুদ্ধ ভাষাটা শিখ। এরপর দেশের বাইরে পড়তে যাবি।'

লাবণ্য আহ্লাদিত হয়ে বলল, 'পদ্মজা শিখায়া দিব।এইডা কোনো ব্যাপার না দাভাই।'

'আপাতত ঢাকা চল। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে অভ্যস্ত হ। এরপর সত্যি পাঠাব।'

'তুই পাগল হইয়া গেছস বাবু? এই ছেড়িরে একা বাইরে পাডাইয়া দিবি?'

'জাফর ভাই আছে,ভাবি আছে। সমস্যা নেই আম্মা। একটাই তো বোন আমার। নিজের মতো পড়াশোনা করুক।'

ফরিনা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। মজিদ কথা বলছেন না। মানে তিনিও আমিরের দলে। তাহলে আর কথা বলে কী হবে? এই সংসারে এমনিতেও তার দাম নেই। কেউ কথা শুনে না। নিজের মতোই বকবক করেন। ফরিনা উঠে চলে যান। হেমলতা বললেন,'কালই চলে যেতে হবে? দুই-তিন দিন পর হবে না?'

আমির নম্র ভাবে বলল, 'না আম্মা। আমি আট বছর হলো ঢাকা গিয়েছি। এর মধ্যে এই প্রথম তিন মাসের উপর গ্রামে থেকেছি। ব্যবসা ফেলে এসেছি। আমার অনুপস্থিতিতে আলমগীর ভাইয়া সামলে ছিল। এখন তো ভাইয়াও চলে এসেছে। আর আমার ব্যবসা আমারই সামলানো উচিত। যত দ্রুত সম্ভব যেতে চাই। আপত্তি করবেন না।'

হেমলতা পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন,'তাহলে আগামীকালই যাচ্ছো?'

'জি। আব্বা,আম্মাকে তো অনেক আগেই বলেছি। পদ্মজাও জানে। কিন্তু পদ্ম ভাবেনি সত্যি সত্যি যাব। দেখুন, কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কাল চলে যাব বলেই আজ আপনাকে নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা মেয়ের সাথে থাকেন। আবার কবে দেখা হয়!'

হেমলতা বেশ অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। তারপর বললেন,'তোমাদের কীসের ব্যবসা আজও জানলাম না।'

মজিদ অবাক হয়ে বললেন,'আত্মীয় হলেন এতদিন এখনও জানেননি মেয়ের জামাই কীসের ব্যবসা করে! বাবু, এটাতো বলা উচিত ছিল?'

'আমিতো ভেবেছি জানেন। তাই বলিনি। আম্মা,আমাদের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস। মানে মালামাল বিভিন্ন দেশে আমদানি -রপ্তানি করা হয়। এ কাজে আব্বা,রিদওয়ান, ভাইয়া,চাচা আছে। তাছাড়া, নিম্নমানের দেশগুলো থেকে কম দামে পণ্য এনে উন্নত দেশগুলোতে বেশি মূল্যে বিক্রি করি। সব পণ্য গোডাউনে রাখা হয়। আমাদের অফিসও আছে। গোডাউন আর অফিসের সব কাজ আমাকে সামলাতে হয়। বলতে পারেন, আমারই সব।'

'অনেক বড় ব্যাপার।' হেসে বললেন হেমলতা। তিনি জানতেন না আমির এতোটা বিত্তশালী। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস কম কথা নয়। এ সম্পর্কে মোটামুটি তিনি জানেন। কলেজ থাকাকালীন জেনেছেন।

পদ্মজাকে পূর্ণা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। পদ্মজা বলল,'কথা বলছিস না কেন?"

'কাল চলে যাবা আপা?'

'তাই তো কথা হচ্ছে।'

'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে।'

'কাঁদছিস কেন? আসব তো আমি।'

'সে তো অনেক অনেক মাস পর পর।'

পদ্মজা কিছু বলতে পারল না। হেমলতা কথা বলছেন আমির আর মজিদের সাথে। খলিল,আলমগীর নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। বিকেল থেকে রিদওয়ানের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার উপর চোখ রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল,'আম্মা খুব শুকিয়েছে। খায় না?'

'না। মাঝে মাঝে সারাদিন পার হয়ে যায় তবুও খায় না।'

'জোর করে খাওয়াতে পারিস না?'

'ধমক মারে। শুনে না কথা।'

'আম্মা ঘাড়ত্যাড়া।"

'ঠিক বলেছো।'

'উনি কেমন? ঝগড়া করে আম্মার সাথে?'

'উনিটা কে?'

'আব্বার প্রথম বউ।'

'তুমিতো দেখতেও যাওনি।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে চাইলেই যাওয়া যায় না। বল না,কেমন? আদর করে তোদের?'

'ভালো খুব। সহজ,সরল। আম্মাকে খুব মানে। প্রেমা-প্রান্তকে অনেক আদর করে। দেখতেও খুব সুন্দর। আগে সাপুড়ের বউদের মতো সাজতো। আমার পছন্দ না বলে এখন আর সাজে না।'

'তুই নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করিস?'

'এখন করি না। তুমি কাকে দিয়ে এতো খোঁজ রাখো?'

'সে তোর জানতে হবে না। তাহলে উনি ভালো তাই তো?'

'হুম।'

'মিলেমিশে থাকিস তাহলে।'

'ঢাকা যাওয়ার আগে দেখে যাও একবার।'

'বাপের প্রথম বউকে দেখার ইচ্ছে নেই আমার।' পদ্মজা থমথমে স্বরে বলল।

পূর্ণা বলল,'আচ্ছা। আমি আজ তোমার সাথে ঘুমাব।'

'হুম ঘুমাবি। আম্মার খেয়াল রাখবি। আম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে,কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করে। সারাক্ষণ ভাবে। তুই কথা বলবি,সময় দিবি।'

Kobitor.com

'আমি তোমার মতো সব সামলাতে পারি না।'

'চেষ্টা করবি। ভোরে উঠে মগা ভাইয়াকে পাঠাব। আব্বা আর প্রেমা-প্রান্তকে নিয়ে আসতে। সবাইকে চোখের দেখা দেখে যাব।'

পূর্ণা পদ্মজাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কান্না পাচ্ছে খুব। কত দূরে চলে যাবে তার আপা! পদ্মজা অনুভব করে পূর্ণার ভেতরের আর্তনাদ। সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'খুব দ্রুত আসব।'

____

পদ্মজা মাঝে শুয়েছে। তার দুই পাশে হেমলতা আর পূর্ণা। পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। আর পদ্মজা হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। হেমলতা নিরবতা ভেঙে পদ্মজাকে বললেন,'পদ্ম?'

'হু,আম্মা?'

' শহরে নিজেকে মানিয়ে নিবি। শক্ত হয়ে থাকবি। আর মনে রাখবি, কেউ কারোর না। সবাই একা। সবসময় নিজের উপর বিশ্বাস রাখবি,নিজের উপর আস্থা রাখবি। সৎ পথে থাকবি। কখনো কারো উপর নির্ভরশীল হবি না। যদি তুই কারো উপর ভালো থাকার দায়িত্ব দিয়ে দিস,কখনো ভালো থাকবি না। নিজের ভালো থাকার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়। নিজেকে কখনো একা ভাববি না। যেখানেই থাকি আমি, আমার প্রতিটা কথা তোর সাথে মিশে থাকবে। ছায়া হয়ে থাকবে। আল্লাহ সবাইকে কোনো না কোনো উদেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হলে আর বেঁচে থাকার মানে থাকে না। মৃত্যুতে ঢলে পড়ে। আমার ইদানীং মনে হয়, আমার দায়িত্ব ছিল তোকে জন্ম দেয়া,বড় করে তোলা,বাস্তবতা দেখানো। সেই দায়িত্ব কতটুকু রাখতে পেরেছি জানি না। কিন্তু তোর দায়িত্ব অনেক বড় কিছু!'

পদ্মজা চাপা স্বরে বলল,'কী সেটা?'

'জানি না।'

'তুমি এতো কী ভাবো আম্মা? মুখটা এরকম ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করবে। আমি পরেরবার এসে যেন দেখি,মোটা হয়েছো।

হেমলতা হাসলেন। সাদা ধবধবে দাঁত ঝিলিক মারে। তিনি পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন,'পরেরবার যখন আসবি একদম অন্য রকম দেখবি।'

'কথা দিচ্ছো?'

'দিচ্ছি।'

পদ্মজা হাসল। পূর্ণা বলল,'আমাকেও জড়িয়ে ধরো আপা।'

Kobitor.com

পদ্মজা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে। আর হেমলতা দুই মেয়েকে একসাথে জড়িয়ে ধরেন। তারপর বললেন,'এবার চুপচাপ ঘুম হবে। কোনো কথা না।'

মাঝরাতে হেমলতার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ খুলে কান খাড়া করে শুনেন,কেউ হাঁটছে। কাঁথা গা থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামেন। সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন। পায়ের শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে যান। সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা পুরুষের অবয়ব দেখতে পান। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলেন,'রিদওয়ান? '

রিদওয়ান কেঁপে উঠে পিছনে ফিরল। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে,দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হেমলতা প্রশ্ন করলেন,'এত রাতে এখানে কী করছো?'

'জ...জি হাঁটছিলাম।'

'এতো রাতে?'

'প্রায়ই হাঁটি। জিজ্ঞাসা করতে পারুন অন্যদের।'

হেমলতা রিদওয়ানকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে নিয়ে বলল,' কোনোভাবে আমাকে খুন করতে এসেছো কী?'

রিদওয়ান থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'ন..না না! আপনাকে কেন খ..খুন করতে যাবো?'

'প্রমাণ সরাতে।' হেমলতার সহজ কথা।

রিদওয়ান হঠাৎই অন্যরকম স্বরে কথা বলল, 'সে তো আমিও একজন প্রমাণ। স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্বলন্ত প্রমাণ। আপনিও আমাকে খুন করে প্রমাণ সরাতে পারেন। যেহেতু দুজনই একই পথের। কাউকে কারোর খুন করার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে অন্য কাজে এসেছি।'

হেমলতা কঠিন চোখে তাকান। পরপরই চোখ শীতল করে নিয়ে বললেন,'শুভ রাত্রি।

রিদওয়ান হেসে হেলেদুলে হেঁটে চলে যায়। হেমলতা ঘরের ঢুকার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। হাঁটার পূর্বেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। ভাগ্যিস আওয়াজ হয়নি! তিনি হাতে ভর দিয়ে উঠার চেষ্টা করেন। বাম হাতের মাংস পেশি শক্ত হয়ে আছে। হাত নাড়াতে কষ্ট হয়। ভর দিয়ে উঠা আরো কষ্টদায়ক। তিনি ওভাবেই বসে থাকলেন অনেকক্ষণ।

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৪৩

____

পাখিদের কলতানে পদ্মজার ঘুম ভাঙল। পদ্মজা জানালার ফাঁক গলে আসা দিনের আলো দেখতে পেল। সে তড়িঘড়ি করে উঠে বসে। অন্যদিন ফজরের আযানের সাথে সাথে উঠে পড়ে। আজ দেরি হয়ে গেল!

'পূর্ণাকে তুলে নিয়ে যা। একসাথে অযু করে নামায পড়তে বস।'

হেমলতার কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ঘুরে তাকাল। তিনি কোরঅ◌ান শরীফ পূর্বের জায়গায় রেখে বললেন, 'পূর্ণাকে একটু বুঝ দিস। নামায পড়তে চায় না।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

পদ্মজা পূর্ণাকে ডেকে নিয়ে কলপাড়ে যায়। এরপর দুই বোন একসাথে নামায পড়তে বসল। নামায শেষ করে হেমলতার সামনে এসে দাঁড়াল পদ্মজা। হেমলতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা হেমলতার চোখ দেখে বলল, 'আম্মা, তোমার চোখ এমন লাল হলো কেন?'

হেমলতা দুই চোখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'রাতে ঘুমাইনি তাই।'

পদ্মজা উৎকণ্ঠা,'কেন? কেন ঘুম হয়নি? কীরকম দেখাচ্ছে তোমাকে। বিছানায় পড়াটাই শুধু বাকি।'

কিছু চুল পদ্মজার মুখের উপর চলে এসেছে। হেমলতা তা কানে গুঁজে দিয়ে আদরমাখা কণ্ঠে বললেন,'আজ আমার মেয়ে চলে যাবে। তাই আমি সারারাত জেগে আমার আদরের মেয়েকে দেখেছি।'

হেমলতার কথা শুনে পদ্মজা আবেগী হয়ে উঠে। হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে কান্নামাখা কণ্ঠে বলল, 'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে। চলো আমার সাথে। একসাথে থাকব। তোমার না ইচ্ছে ছিল,আমাকে নিয়ে শহরে থাকার।

'পাগল হয়ে গেছিস! মেয়ের জামাইর বাড়িতে কেউ গিয়ে থাকে? ২-৩ দিন হলে যেমন তেমন।'

হেমলতার শরীরের উষ্ণতা পদ্মজাকে ওম দিচ্ছে। মায়ের উষ্ণতায় কী অদ্ভুত শান্তি! পদ্মজা কান্না করে দিল। হেমলতা পদ্মজার মুখ তুলে বললেন, 'সকাল সকাল কেউ কাঁদে? বাড়ির বউ তুই, শ্বাশুড়ি কী করছে আগে দেখে আয়। যা।'

পদ্মজা আরো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছছে। আবার ভিজে যাচ্ছে। বুকটা হাহাকার করছে। কত দূরে চলে যাবে সে!

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। পিছন থেকে শোনা যায়,হেমলতা বলছেন,

'বাচ্চাদের মতো করছিস কিন্তু।'

পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে। ঢোক গিলে নিজেকে শক্ত করল। এরপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। পদ্মজা ঘর ছাড়তেই হেমলতার চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্রুত জল মুছেন। পালঙ্কের দিকে চেয়ে দেখেন,পূর্ণা চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে। কখন ঘুমাল? হেমলতার হাসি পেয়ে গেল। তিনি কাঁথা দিয়ে পূর্ণাকে ঢেকে দিলেন।

পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকতেই ফরিনা মুখ ঝামটালেন,'আইছো ক্যান? যাও ঘুমাও গিয়া।'

'কখন এতো দেরি হয়ে গেছে বুঝিনি।' মিনমিন করে বলল পদ্মজা'

'বুঝবা কেন? মা আইছে তো। হউরির লগে তো আর মায়ের মতো মিশতে মন চায় না।'

পদ্মজা অবাক হয়ে তাকাল। আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,'আমিতো মিশতেই চাই। আপনি সবসময় রেগে থাকেন।'

'মুখের উপরে কথা কইবা না। যাও এহন।'

পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায় চলে যাওয়ার জন্য। ফরিনা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন,'কইতেই যাইবাগা নাকি? জোর কইরা তো কাম করা উচিত। এই বুদ্ধিডা নাই?'

পদ্মজা স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন সে কাজ করার জন্য জোরাজুরি করে,কিন্তু ফরিনা করতে দেন না। এজন্যই সে এক কথায় চলে যাচ্ছিল। আর এখন কী বলছেন! সে ব্যাপারটা হজম করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। ফরিনা গলার স্বর পূর্বের অবস্থানে রেখেই বললেন,' হইছে,কাম করতে হইব না। এরপর তোমার মায়ে কইবো দিনরাত কাম করাই তার ছেড়িরে। যাও। বারায়া যাও।'

পদ্মজা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লতিফা ঠোঁট চেপে হাসছে। ফরিনার এমন ব্যবহারের সাথে সে অভ্যস্ত। বেশ অনেকক্ষণ পর পদ্মজা বলল, 'আম্মা,আমি করবটা কী?'

পদ্মজা মাথা থেকে ঘোমটা সরে গেছে। মুখটা দেখার মতো হয়েছে। ফরিনা পদ্মজার মুখ দেখে হেসে ফেললেন। আবার দ্রুত হাসি লুকিয়েও ফেললেন। এই মেয়েটাকে তিনি অনেক আগেই ভালোবেসে ফেলেছেন। এতো শান্ত,এতো নম্রভদ্র! হেমলতাকে হিংসে হয়। হেমলতার গর্ভকে হিংসে হয়। পদ্মজার ঢাকা যাওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম ঘোর আপত্তি ছিল ফরিনার। কিন্তু এখন নেই। উপর থেকে যাই বলুন না কেন, তিনি মনে মনে চান পদ্মজা পড়তে যাক। অনেক পড়ুক। অনেক বেশি পড়ুক। এই মেয়ের জন্ম রান্নাঘরে রাঁধার জন্য নয়। রানীর আসনে থাকার জন্য। পদ্মজা ফরিনার দুই সেকেন্ডের মৃদু হাসি খেয়াল

করেছে। সে সাহস পেল। ফরিনার কাছে এসে দাঁড়ায়। ফরিনা চোখমুখ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন,'ঘেঁষতাছো কেন?'

পদ্মজা শিমুল তুলোর ন্যায় নরম স্বরে বলল,'আমার খুব মনে পড়বে আপনাকে। আপনার বকাগুলোকে। আপনি খুব ভালো।'

ফরিনা তরকারিতে মশলা দিচ্ছিলেন। হাত থেমে যায়। পদ্মজার দিকে তাকান। পদ্মজা বলল, 'আমি আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরব আম্মা?'

ফরিনা কিছু বলতে পারলেন না। এই মেয়েটা এতো অদ্ভুত, এতো ভালো কেন? পদ্মজার চোখের দিকে চেয়ে অনুভব করেন, কয়েক বছরের লুকোনো ক্ষত জ্বলে উঠেছে। ক্ষতরা পদ্মজার সামনে উন্মোচন হতে চাইছে। কোনোভাবে কী যন্ত্রনাদায়ক এই ক্ষত সারাতে পারবে পদ্মজা? ভরসা করা যায়? পদ্মজার মায়ামাখা দুটি চোখ দেখে বুকে এমন তোলপাড় শুরু হয়েছে কেন? ৩২ বছর আগের সেই কালো রাত্রির কথা কেন মনে পড়ে গেল? যে কালো রাত্রির জন্য আজও এই সংসার,এই বাড়িকে তিনি আপন ভাবতে পারেন না। প্রতিটি মানুষের সাথে বাজে ব্যবহার করেন। সেই যন্ত্রণা কেন বুক খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

উত্তরের আশায় না থেকে পদ্মজা জড়িয়ে ধরল ফরিনাকে। ফরিনা মৃদু কেঁপে উঠলেন। এরপর পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার বুকে মাথা রাখতেই টের পেল,ফরিনার বুক ধুকধুক, ধুকধুক করছে।

____

হাওলাদার বাড়ির থেকে ডানে দুই মিনিট হাঁটার পর ঝাওড়া নামের একটি খালের দেখা পাওয়া যায়। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাওলাদার বাড়ির সবাই। ট্রলার নিয়ে মাঝি অপেক্ষা করছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। পদ্মজা পরনে কালো বোরকা। লাবণ্য যাবে না। সকাল থেকে তার ডায়রিয়া শুরু হয়েছে। তিন-চার দিন পর আলমগীর ঢাকা নিয়ে যাবে। আজ আমির আর পদ্মজা যাচ্ছে। প্রেমা,প্রান্ত,মোর্শেদ,বাসন্তী সবাই সকালেই এসেছে। সবার সাথে কথা হয়েছে। পূর্ণা হেঁচকি তুলে কাঁদছে। হেমলতা পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিলেন। তারপর বললেন,'ঠিক মতো পড়বি,খাবি। স্বামীর খেয়াল রাখবি। কাঁদবি না কিন্তু। একদম কাঁদবি না।'

'তুমি কাঁদছো কেন আম্মা?'

'না,না কাঁদছি না।' বলেও হেমলতা কেঁদে ফেললেন। পদ্মজার কান্নার বেগ বেড়ে যায়। বোরকা ভিজে একাকার। একদিকে মা অন্যদিকে তিন ভাই-বোন কেঁদেই চলেছে। হেমলতা নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন,পারছেন না। পদ্মজা বলল, 'আর কেঁদো না আম্মা। তুমি অসুস্থ।'

হেমলতা ঢোক গিলেন কান্না আটকাতে। তারপর বললেন, 'কাঁদব না। সাবধানে যাবি। দেরি হচ্ছে তো। আমির,নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। যা মা। সাবধানে যাবি। নিয়মিত নামায পড়বি।'

পদ্মজা হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। পদ্মজার দেখাদেখি আমিরও করল। বাড়ির সব গুরুজনদের সালাম করে ট্রলারে পা রাখতেই হেমলতার কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দমালা ভেসে আসে,'আমার প্রতিটা কথা মনে রাখবি। কখনো ভুলবি না। আমার মেয়ে যেন অন্য সবার চেয়ে গুণেও আলাদা হয়। শিক্ষায় কালি যেন না লাগে।'

পদ্মজা ফিরে চেয়ে বলল, 'ভুলব না আম্মা। কখনো না। তুমি চোখের জল মুছো। আমাদের আবার দেখা হবে।'

হেমলতা তৃতীয় বারের মতো চোখের জল মুছেন। এরপর হাত নেড়ে বিদায় জানান। ট্রলার ছেড়ে দেয়। পদ্মজা এক দৃষ্টে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমলতা চেয়ে থাকেন পদ্মজার দিকে। দুজনের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় বর্ষণ হচ্ছে। কাঁদছেন মোর্শেদ। তবে পদ্মজার জন্য কম,হেমলতার জন্য বেশি। হেমলতার দিনগুলো এখন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আরো কাঁদছেন ফরিনা। প্রতিদিন বাড়িজুড়ে একটা সুন্দর মুখ,সুন্দর মনের জীবন্ত পুতুল মাথায় ঘোমটা দিয়ে আর হেঁটে বেড়াবে না। আবারও মরে যাবে তার দিনগুলো। হারিয়ে যাবে সাদা কালোর ভীড়ে।

মাদিনী নদীর ঠান্ডা আদ্রতা বাতাসে মিশে ছুঁয়ে দিচ্ছে পদ্মজার মুখ। জল শুকাতে শুকাতে আবার ভিজে যাচ্ছে। আমির পদ্মজার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল,'এবার তো থামো।'

আমিরের আলত ছোঁয়ায় পদ্মজা আরো প্রশ্রয় পেয়ে কাঁদতে থাকল। আমির বলল, 'এ তো আরো বেড়ে গেছে! থামো না। আমি আছিতো। আমরা ছয় মাস পর পর আসব। অনেকদিন থেকে যাবো।'

'সত্যি তো? কাজের বাহানা দেখাবেন না?'

'মোটেও না।' আমির পদ্মজার চোখের জল মুছে দিল। এরপর চোখের পাতায় চুমু দিল। পদ্মজা নুয়ে যায়। বলল, 'নদীর পাড় থেকে কেউ দেখবে।'

'কেউ দেখবে,কেউ দেখবে,কেউ দেখবে! এই কথাটা ছাড়া আর কোনো কথা পারে আমার বউ?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বলল, 'আমরা ট্রলার দিয়ে ঢাকা যাব?'

'সেটা সম্ভব না। কিছুক্ষণ পরই ট্রেনে উঠে যাবো।'

Kobitor.com

আমির পদ্মজাকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, আমিরকে হতবাক করে দিয়ে পদ্মজা ট্রলারের ভেতর ঢুকে গেল।

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৪৪

____

ট্রেনের বগিতে হেঁটে সামনে এগোচ্ছে আমির। তার এক হাতে লাগেজ অন্য হাতে পদ্মজার হাত। শক্ত করে ধরে রেখেছে,যেন ছেড়ে দিলেই হারিয়ে যাবে। পদ্মজার মুখ নিকাবের আড়ালে ঢেকে রাখা। সে এদিকওদিক তাকিয়ে আমিরকে প্রশ্ন করল,'খালি সিট রেখে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'কেবিনে।'

ততক্ষণে দুজন ৭৬ নাম্বার কেবিনের সামনে চলে আসে। আমির দরজা ঠেলে পদ্মজাকে নিয়ে ঢুকল। চারটা বার্থ। চারজনের কেবিন বোঝাই যাচ্ছে। পদ্মজা বলল, 'আরো দুজন আসবে কখন? ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।'

'চার বার্থই আমাদের।'

পদ্মজা ডান পাশের বার্থে বসতে বসতে বলল, 'অনেক খরচ করেছেন।'

আমির লাগেজ জায়গা মতো রেখে পদ্মজার পাশে বসল। বলল, 'নিকাব খুলো এবার। কেউ আসছে না।'

পদ্মজা নিকাব খুলল। ঝমঝম শব্দ তুলে ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। আমির জানালা খুলে দিতেই পদ্মজার চুল তিরতির করে উড়তে থাকল। পদ্মজা দ্রুত দুই হাত মুখের সামনে ধরে, বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আমির বাম পাশের বার্থে বসে হাসল। বলল, 'হাত সরাও। দেখি একটু বউটাকে।'

পদ্মজা দুই হাত সরাল। ঠোঁটে আঁকা হাসি। চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে। চুল অবাধ্য হয়ে উড়ছে। আমির এক হাতের উপর থুতুনির ভর দিয়ে বলল,'এই হাসির জন্য দুনিয়া এফোঁড়ওফোঁড় করতে রাজি।'

পদ্মজা দাঁত বের করে হাসল। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। আমির পদ্মজার পাশে এসে বসে,পদ্মজার চুল খোঁপা করে দিল। তারপর বলল, ' এবার বোরকাটা খুলে ফেল। গরম লাগছে না?'

পদ্মজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। আমির বলল,'কেউ আসবে না পদ্মবতী। পৌঁছাতে বিকেল হবে। নিশ্চিন্তে শুধু বোরকা খুলতে পারো। আর কিছু খুলতে হবে না।'

পদ্মজার কান রি রি করে উঠে। আমিরের উরুতে কিল দিয়ে বলল,'ছিঃ।'

আমির উচ্চস্বরে হেসে উঠল। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে বোরকা খুলে। এরপর জানালার ধারে বসে বলল, 'আমরা যে বাড়িতে যাচ্ছি,আর কে কে থাকে?'

'একজন দারোয়ান আর একজন বুয়া আছে। যে বাড়ি না তোমার বাড়ি।''

'উনারা বিশ্বস্ত?'

'নয়তো রেখে এসেছি?'

পদ্মজা কিছু বলল না। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে বসল। পদ্মজার কানের দুলে টোকা দিয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে বসে। শীতল একটা অনুভূতি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে স্বভাববশত বলে উঠে, 'কেউ দেখবে!'

আমির ভ্রুকুঞ্চন করে চোখ তুলে তাকায়। পদ্মজা বুঝতে পারে, সে ভুল শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেছে। জিহ্বা কামড়ে আড়চোখে আমিরকে দেখে হাসার চেষ্টা করল। আমির বেশ অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, পদ্মজার ঘাড়ে নাক ডুবিয়ে বলল, 'দেখুক। যার ইচ্ছে দেখুক।'

দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ। শব্দে পদ্মজার ঘুম ছুটে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে,মনে পড়ছে না। আমিরের কোলে তার মাথা ছিল। মানুষটা এতক্ষণ বসে ছিল? পদ্মজাকে এভাবে উঠতে দেখে আমির ইশারায় শান্ত হতে বলল। পদ্মজা দ্রুত নিকাব পড়ে নেয়। এরপর আমির দরজা খুলল। ঝালমুড়ি নিয়ে একজন লম্বা ধরণের লোক দাঁড়িয়ে আছে। নাকটা মুখের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। আমির বলল, 'এভাবে অনুমতি না নিয়ে টোকা দেয়া অভদ্রতা। আমাদের দরকার পরলে আপনাদের এমনিতেই খুঁজে নিতাম। আর এমন করবেন না। আপনার জন্য আমার বউয়ের ঘুম ভেঙে গেছে। নিন টাকা। ঝালমুড়ি দেন।'

লোকটি বেশ আনন্দ নিয়ে ঝালমুড়ি বানিয়ে দিল। বোধহয় আর বিক্রি হয়নি। হতে পারে আমিরই প্রথম কাস্টমার। লোকটি চলে গেল। আমির কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপর পদ্মজাকে বলল, ' একজন লোক ঝালমুড়ি বিক্রি করতে এসেছিল। এই নাও খাও। এরপর আবার ঘুমাও।'

দুজনে একসাথে ঝালমুড়ি খেতে খেতে সুখ-দুঃখের গল্প শুরু করে। আমির তার শহুরে জীবনের গতিবিধি বলছে। কখন কখন বাসায় থাকে। কীভাবে ব্যবসায় সময় দেয়। পদ্মজা মন দিয়ে শুনছে। একসময় পদ্মজা বলল, 'একটা কথা জানার ছিল।'

'কী কথা?'

"আমার মনে হচ্ছে,আপনাদের বাড়িতে লুকোনো কোনো ব্যাপার আছে। শুধু মনে হচ্ছে না , একদম নিশ্চিত আমি।'

আমির উৎসুক হয়ে ঝুঁকে বসল। আগ্রহভরে জানতে চাইল,"কীরকম?'

পদ্মজা আরো এগিয়ে আসে। আকাশে দুপুরের কড়া রোদ। ছলাৎ করে রোদের ঝিলিক জানালায় গলে কেবিনে ঢুকে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। বাতাস ভ্যাপসা গরম। মাঝে মাঝে শীতল,ঠান্ডা। সেসব উপেক্ষা করে পদ্মজা তার ভেতরের সন্দেহগুলো বলতে শুরু করল,'রুম্পা ভাবিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি নিশ্চিত। কেন বন্দি করে রাখা হয়েছে সেটা দাদু জানেন। উনি সবসময় রুম্পা ভাবির ঘরের দরজায় নজর রাখেন। আমি অনেকবার ঢুকতে চেয়েছি,পারিনি। বাড়ির পিছনের জঙ্গলে কিছু একটা আছে। সেটা ভূত,জ্বীন জাতীয় কিছু না। অন্যকিছু। এমনটা মনে হওয়ার তেমন কারণ নেই। আমার অকারণেই মনে হয়েছে, জঙ্গলটা আপনাআপনি সৃষ্টি হয়নি আর ভয়ংকরও হয়নি। কেউ বা কারা এই জঙ্গলটিকে যত্ন করে তৈরি করেছে। ভয়ংকর করে সাজিয়েছে। এছাড়া, বাড়ির সবাইকে আমার সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

আমির একটুও অবাক হলো না,মুখের প্রকাশভঙ্গী পাল্টালো না। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'জানি আমি এসব।'

পদ্মজা আমিরের দুই হাত খামচে ধরে এক নিঃশ্বাসে বলল,'আমাকে বলুন। অনুরোধ লাগে,বলুন। আমি শুনতে চাই। অনেকদিন ধরে নিজের ভেতর পুষে রেখেছি।'

আমির অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,'আমার ধারণা তোমার ধারণা অবধিই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে কিছু জানি না। এই রহস্য খুঁজে বের করার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও আমি হজম করেছি। আমার ইচ্ছে মাটিচাপা দিয়েছি।'

আমিরের গলাটা কেমন শুনাল। পদ্মজা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,'কেন? কেন দিয়েছেন?'

আমির হাসল। বলল,'ধুর! এখন এসব গল্প করার সময়? শুনো, এরপর কী করব....'

পদ্মজা কথার মাঝে আটকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল,'কথা ঘুরাবেন না। আমি খেয়াল করেছি,হাওলাদার বাড়ির প্রতি আপনি উদাসীন। কোনো ব্যাপার পাত্তা দেন না। সবসময় বাড়ির চেয়ে দূরে দূরে থাকেন। কোনো ঘটনায় নিজেকে জড়ান না। কেন নিজেকে গুটিয়ে রাখেন?'

আমিরের দৃষ্টি অস্থির। সে এক হাতে বার্থ খামচে ধরার চেষ্টা করে। ঘন ঘন শ্বাস নেয়। পদ্মজা খুব অবাক হয়! আমিরের এতো কষ্ট হচ্ছে কেন?

পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'কী হলো আপনার? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'

'না! কিছু হয়নি। এই পদ্মজা?'

আমির চট করে পদ্মজার দুই হাত শক্ত করে ধরল। চোখ দুটিতে ভয়। পদ্মজা আমিরের চোখের দিকে তাকাল। আমির বলল,'আমার তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে। অনেকবার বলতে গিয়েও পারিনি। আজ যখন কথা উঠেছে...আচ্ছা পদ্মজা, আমার পরিচয় জেনে আমাকে ছেড়ে যাবে না তো? আমি তোমাকে হারালে একাকীত্বে ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ হয়ে যাব। আমার জীবনের একমাত্র সুখের আলো তুমি।'

পদ্মজার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। সে পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারছে না। আমির উত্তরের আশায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ধীর কণ্ঠে বলল,'লুকোনো সব কথা বলুন আমাকে। আপনি আমার স্বামী। আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনো ভাবি না আমি। বিশ্বাস করুন!'

আমির নতজানু হয়ে বলল,'আমি আমার আব্বার অবৈধ সন্তান। আমার জন্মদাত্রী জন্ম দিয়েই মারা যায়। দিয়ে যায় অভিশপ্ত জীবন।'

পদ্মজা দুই পা কেঁপে উঠে। মাথা ভনভন করে উঠে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত গড়িয়ে যায়। আমির ঢোক গিলে আবার বলল,'আমার জন্মদাত্রী মারা যাওয়ার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আমার বর্তমান আম্মা আমাকে দেখে খুব রেগে যায়। কিছুতেই আমাকে মানতে চায়নি। তখন ছেলেমেয়ে ছিল না আম্মার। তাই মাস ঘুরাতেই আমাকে মেনে নিল। ছেলের মতো আদর শুরু করল। এসব দাদুর মুখে পরে শুনেছি। আব্বা আমাকে তুলে এনে জায়গা দিলেও সন্তানের মতো ভালোবাসেননি কখনো। যখন আমার এগার বছর আমি আর রিদওয়ান একসাথে জানতে পারি,আমি আব্বার অবৈধ সন্তান। আব্বা আবার রিদওয়ানকে খুব আদর করতেন। রিদওয়ান ছোট থেকেই আমার সাথে ভেজাল করতো। ঝগড়া করতো। যখন এমন একটা খবর জানতে পারল,ও আরো হিংস্র হয়ে উঠে। আমি তখন অনেক শুকনো আর রোগা ছিলাম। রিদওয়ান স্বাস্থ্যবান, তেজি ছিল। আব্বার এমন ছেলেই পছন্দ। কেন পছন্দ জানি না। উনিশ থেকে বিশ হলেই রিদওয়ান খুব মারতো। আব্বার কাছে বিচার দিলে রিদওয়ান আরো দশটা বানিয়ে বলতো। তখন আব্বা আমাকে মারতেন। রিদওয়ান একবার আমাকে জঙ্গলে বেঁধে ফেলে রেখেছিল। দেড় দিন পড়ে ছিলাম। রাতে ভয়ে প্যান্টে প্রস্রাব করে দিয়েছি। মুখ বাঁধা ছিল। তাই এতো চিৎকার করেছি তবুও কেউ শুনেনি। ভয়ে বুক কাঁপছিল। মনের ভয় মিশিয়ে ভয়ংকর ভয়ংকর ভূত,দানব দেখেছি। বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না। দেড়দিনের সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন,ফকির মিয়া নামে একজন,উনি আমাকে জঙ্গলে বাঁধা অবস্থায় পান। বাড়িতে বৈঠক বসে। রিদওয়ানকে দুটো বেতের বারি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। রিদওয়ান এক তো বলিষ্ঠবান তার উপর আমার দুই বছরের বড়। কিছুতেই পেরে উঠতাম না।পানিতে ঠেসে ধরে রেখেছে অনেকবার। ওর মস্তিষ্ক অসুস্থ। আমার জীবন জাহান্নাম হয়ে উঠে। আম্মাকে বললেও আম্মা বাঁচাতে পারতেন না। সবসময় নিশ্চুপ। কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যখন আমার পনেরো বয়স শীতের রাতে পালিয়ে যাই। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। এরপরদিন চোখ খুলে দেখি,আমি হাওলাদার বাড়িতে। আমার সামনে রিদওয়ান, আব্বা,চাচা,আম্মা সবাই। বুঝে যাই,আমার কোনো জায়গা নাই আর। এখানেই থাকতে হবে। যতই কষ্ট হউক থাকতে হবে।'

আমিরের কণ্ঠে স্পষ্ট কান্না। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা হেঁচকি তুলে কাঁদছে। আমির অশ্রুসজল চোখ মেলে পদ্মজার দিকে তাকাল। হেসে ফেলল। পদ্মজার দুই চোখের জল মুছে দিয়ে বলল,'আরেএ পাগলি! কাঁদছো কেন? এসব তো পুরনো কথা। আমার পড়াশোনাটা আবার চলছিল ভালোই।

আমি ভালো ছাত্র ছিলাম। এ দিক দিয়ে বুদ্ধিমান ছিলাম। সবসময় ভালো ফলাফল ছিল। এজন্য কদর একটু হলেও পেতাম। যখন আমার আঠারো বয়স বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করি। রাত করে অদ্ভুত কিছুর শব্দ শুনি। জঙ্গলে আলো দেখতে পাই। চাচাকে প্রায় রাতে জঙ্গলে যেতে দেখি। রিদওয়ান আর চাচা মিলে কিছু একটা নিয়ে সবসময় আলাপ করতো। ওদের চোখেমুখে থাকতো লুকোচুরি খেলা। আমি একদিন রাতে চাচাকে অনুসরণ করি। প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর চাচা দেখে ফেলে। এই ভুলের জন্য কম মার খেতে হয়নি সেদিন! তবুও বেহায়ার মতো কয়দিন পর আবার অনুসরণ করি। রিদওয়ান পিছনে ছিল দেখিনি। আব্বা সেদিন অনেক মারল। দা ছুঁড়ে মারেন। এই যে থুতুনির দাগটা,এটা সেই দায়ের আঘাত। একসময় আব্বা আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। বললেন, আমাকে শহরে পাঠাবেন। পড়ালেখার জন্য। কোনো ব্যবসা করতে চাইলে তারও সুযোগ করে দিবেন। আমি যেন এই বাড়ি আর বাড়ির আশপাশ নিয়ে মাথা না ঘামাই। আমি মেনে নেই। রিদওনায়ের সাথে থাকতে হবে না আর। এর চেয়ে আনন্দের কী আছে? চলে আসি ঢাকা। শুরু হয় নিজের জায়গা শক্ত করার যুদ্ধ। এখানে এসেও অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। তবুও থেমে যাইনি। যুদ্ধ করে চলেছি। আমাকে বাঁচতে হবে। মানুষের মতো বাঁচতে হবে। কারো লাথি খেয়ে না। যখন আমার তেইশ বছর,তখন থেকে আমার কদর বেড়ে যায়। ব্যবসায় মোটামুটি সফল হয়ে যাই। ভাগ্য ভালো ছিল আমার। অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে নিরাশ করেনি। তখন আব্বা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রিদওয়ান আগের মতো হাত তুলার সাহস পায় না। সেই আমি আজ এই জায়গায়। এখন আমার যে অবস্থান হাওলাদার বাড়ির কারোর সাহস নেই আমার চোখের দিকে তাকানোর। আমি চাইলেই শোধ নিতে পারি। কিন্তু নেব না। তারা থাকুক তাদের মতো। রিদওয়ান ছোটবেলা যা করেছে, মেনে নিয়েছি। এখন তোমার দিকেও নজর দিয়েছে। ওর নজর আমার বাড়িগাড়ি,অফিস-গোডাউনেও আছে। আমি টের পাই। ও পারলে আমাকে খুন করে দিত। কিন্তু পারে না। আমার ক্ষমতার ধারেকাছেও ওর জায়গা নেই। এখন আমার নিজের এক বিশাল রাজত্ব আছে। আমার অহংকার করার মতো অনেক কিছু আছে। হাওলাদার বাড়ির কেউ কেউ মিলে আমাকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করছে। আমি নিশ্চিত। তাই হাওলাদার বাড়িতে আমি থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। আম্মা ছাড়া ওই বাড়ির সবার ভালোবাসা মুখোশ মাত্র। আমার দরকার ছিল একজন ভালো মনের সঙ্গিনী। আমি পেয়ে গেছি আর কিছু দরকার নেই। আমি আমার অর্ধাঙ্গিনীকে তার আসল সংসারে নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমার মন শান্ত। কোনো চিন্তা নেই। খুব বেশি সুখী মনে হচ্ছে।'

আমির পদ্মজার হাতে চুমু খেল। পদ্মজা তখনও কাঁদছে। সে আচমকা আমিরকে জড়িয়ে ধরল। গভীরভাবে,শক্ত করে। এরপর কান্নামাখা কণ্ঠে বলল,'আমি কখনো আপনাকে কষ্ট দেব না। কোনোদিন না। কেউ আপনাকে ছুঁতে আসলে আমি তার গর্দান নেব। আমি উন্মাদ হয়ে তাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করব।'

'কারো সেই ক্ষমতা নেই আর। মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো।'

পদ্মজা আরো শক্ত করে ধরার চেষ্টা করে। আমির পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,'এই প্রথম আমার বউয়ের গভীর আলিঙ্গন পেলাম। ভালো লাগছে। ছেড়ো না কিন্তু।'

Kobitor.com

প্লাটফর্মে হাঁটছে ওরা। আমির পদ্মজার এক হাত ধরে রেখেছে। খুব দ্রুত হাঁটছে। পদ্মজা তাল মেলাতে পারছে না। চেষ্টা করছে। মোটরগাড়ি নিয়ে একজন কালোচশমা পরা লোক অপেক্ষা করছিল। আমির সেখানে গিয়ে থামে। লোকটা সালাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ব্যাগ জায়গামতো রাখে। আমির আগে পদ্মজাকে উঠতে বলল। পদ্মজা অবাক হয়। এরকম গাড়ির সাথে সরাসরি পরিচয় নেই তার। কিন্তু প্রকাশ করল না। আমিরের কথামতো গাড়িতে উঠে বসল। এরপর আমির উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করে। আমির পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল,'আমাদের নিজস্ব গাড়ি। কথা ছিল কিন্তু, আমার গাড়ি দিয়ে রাতবেরাতে যখন তখন ঘুরতে বের হবো।'

পদ্মজা কিছু বলল না। সে উপভোগ করছে নতুন জীবন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে। কালো চশমা পরা লোকটা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে আমিরের ডান পাশের দরজা খুলে দিল। আমির পদ্মজাকে নিয়ে নামল। পদ্মজা বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হয়। দ্বৈত(ডুপ্লেক্স) বাড়ি। একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে সালাম দিল। পদ্মজার সাথে পরিচিত হলো। এরপর আসে একজন মধ্যবয়স্ক নারী। ইনি বোধহয় বাড়ির কাজের লোক। সবাই একসাথে বাড়ির ভেতর ঢুকল। পদ্মজা তার নতুন বাড়ি মন দিয়ে দেখছে। পূর্ব দিক থেকে সদর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল বিশাল বৈঠকখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ পাশে বারান্দা তাতে নানা ধরনের ফুল ফুটে আছে টবের মধ্যে, মনে হবে যেন একটা ছোটোখাটো বাগান। বৈঠকখানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণার দিকে বেশ বড় শোবার ঘর। পদ্মজা প্রশ্ন করার আগে আমির বলল,'না,এটা আমাদের ঘর না।'

উত্তর পশ্চিম কোণার দিকে রান্নাঘর এবং টয়লেট। আর এই দুয়ের মাঝে মানে বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের মাঝখানটায় খাওয়ারঘর(ডাইনিং)। বৈঠকখানার মাথার উপর দিকে তাকালে সেখানে সোনালী কালারের ঝাড়বাতি ঝুলছে। বৈঠকখানার উত্তর দিকে একটা সিড়ি সাপের মত পেঁচিয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে সেদিকে হাঁটে। সিঁড়ি পেরুনোর পর হাতের বাঁ দিকে অনেক বড় একটা শোবার ঘর। দামী,দামী জিনিসে সৌন্দর্য আকাশছোঁয়া। দুজন একসাথে ঢুকে। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে সবকিছু দেখছে। আমির বলল,'গোসল করে নাও?'

পদ্মজা বোরকা খুলে কলপাড় খুঁজতে থাকল। আমির গোসলখানার দরজা খুলে দিয়ে বলল,'এইযে এদিকে।'

দুজন একসাথে ফ্রেশ হয়ে রুম থেকে বের হলো। পদ্মজা দুই তলাটা আরেকটু দেখার জন্য ডানদিকে মোড় নিল। প্রথমে চোখে পড়ল বড় ব্যালকনি। এরপর আরেকটা শোবার ঘর। ব্যালকনিতে লতাপাতার ছোট ছোট টব।

____

Kobitor.com

বিরাট অট্টালিকায় সুখের সাথে কেটে যায় পাঁচ মাস। লাবণ্য দেশ ছেড়েছে দুই মাস হলো। বুয়া কাজ ছেড়েছে তিন মাস। পদ্মজা আর কাজের লোক নিতে দিল না। সে এক হাতেই নাকি সব পারবে। তবুও আমির একটা ১২-১৩ বছর বয়সী মেয়ে রেখেছে সাহায্যের জন্য। ভোরের নামায পরে রান্নাবান্না করে পদ্মজা। এরপর শাড়ি পাল্টে নেয়। কলেজে যাওয়ার জন্য। আমিরকে ব্লেজার,টাই পরতে সাহায্য করে। প্রথম যেদিন আমিরকে ব্লেজার পরতে দেখেছিল,অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,'এই পোশাকের নাম কী? আপনাকে খুব বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

আমির হেসে জবাব দিয়েছিল, 'ব্লেজার। বাইরে থেকে আনা।'

এমন অনেক কিছুই পদ্মজার অজানা ছিল। সবকিছু এখন তার চেনাজানা। এই বিলাসবহুল জীবন বেশ ভালো করেই উপভোগ করছে। মানুষটা সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তবুও ফাঁকেফাঁকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। পদ্মজাকে নিয়ে গোডাউন দেখিয়েছে,অফিস দেখিয়েছে। সবকিছু সাজানো, গোছানো। গোডাউনে বিভিন্ন ধরণের পণ্য। কত কত রকমের দ্রব্য। পদ্মজা জীবনে ভালোবাসা এবং অর্থ দুটোই চাওয়ার চেয়েও বেশি পেয়েছে।

সকাল নয়টা বাজে। আমির তাড়াহুড়ো করছে, তার নাকি আজ দরকারি মিটিং আছে। পদ্মজা শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে দৌড়ে দৌড়ে খাবার পরিবেশন করছে। আমির দুই তলা থেকে নেমেই বলল,'আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলেজ চলে যেও।'

'আরেএ,খেয়ে যাবেন তো।'

'সময় নেই। আসছি।'

'খেয়ে যান না।'

'বলছি তো,তাড়া আছে। জোরাজুরি করছো কেন?'

আমির দ্রুত বেরিয়ে যায়। পিছু ডাকতে নেই,তাই পদ্মজা ডাকল না। মনাকে ডেকে বলল,'খেয়ে নাও তুমি।'

মনা পদ্মজার সাহায্যকারী। পদ্মজার ছোটখাটো ফরমায়েশ পালন করে। পদ্মজা বৈঠকখানায় গিয়ে বসে। আজ কলেজে যেতে ভালো লাগছে না। ভোরে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝুম বৃষ্টি। অকারণে মন বিষণ্নতায় চেয়ে আছে। অকারণেও না বোধহয়! আমির বিরক্ত হয়ে কথা বলেছে,এজন্যই বোধহয় মন আকাশে বৃষ্টি নেমেছে। পদ্মজা পুরোটা দিন উপন্যাস পড়ে কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে কলিং বেল বাজে। পদ্মজা দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিল। আমির দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে বাতাস। পদ্মজা বলল, 'আসুন।'

আমির ভেতরে আসে না। সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। পদ্মজা কপাল কুঁচকাল। বলল,'কী হলো? আসুন।'

Kobitor.com

আমির চট করে পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। পদ্মজা চেঁচিয়ে উঠে বলল,'কেউ দেখবে।'

আমির মনাকে ডাকল,'মনা? কই রে? দেখে যা।'

'আপনি ওকে ডাকছেন কেন?'

'এবার কাউকে দেখাবই।'

'উফফ! আল্লাহ,ছাড়ুন।'

'মনা? মনা?'

মনা দুই তলা থেকে নেমে আসে। আমির মনাকে দেখে বলল,'এই দেখ তোর আপারে কোলে নিয়েছি। দাঁড়া,তোর সামনে একটু আদর করি।'

পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। চাপাস্বরে বলল,'মনা কী ভাববে! আমি আর বলব না,কেউ দেখবে। ছেড়ে দিন।'

আমির পদ্মজাকে নামিয়ে দিল। মনা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। আমির বলল,'যা ঘরে যা।'

মনা যেন এইটা শোনার অপেক্ষায় ছিল। দৌড়ে চলে যায়। পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমিরকে গুরুজনদের মতো বলল,'আক্কেলজ্ঞান কখন হবে আপনার? বয়স তো কম হলো না।'

অবিকল পদ্মজার কথার ধরণ অনুসরণ করে আমির বলল,'আর কতদিন কেউ দেখবে কথাটা মুখে থাকবে? বিয়ের তো কম দিন হলো না।'

'আপনি...আপনি কালাচাঁদ না কালামহিষ।'

'এটা পূর্ণা বলতো না? হেহ,আমি মোটেও কালো না।'

'তো কী? এইযে দেখুন,দেখুন। আমার হাত আর আপনার হাত।'

পদ্মজা হাত বাড়িয়ে দেখায়। আমির খপ করে পদ্মজার হাত ধরে চুমু খেয়ে বলল,'এই হাতও আমার।'

পদ্মজা বলল,'ঠেসে ধরা ছাড়া আর কিছু পারেন আপনি? ছাড়ুন।'

আমির পদ্মজার হাত ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকল।

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

Kobitor.com

আমি পদ্মজা - ৪৫

দেখতে দেখতে চলে এসেছে শীতকাল। সকাল দশটা বাজে। অথচ,কুয়াশার চাদরে চারিদিক ঢাকা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। মনটা কু গাইছে। বুকে অজানা একটা ঝড় বইছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। ঢাকা আসার পর থেকে নিয়মিত পূর্ণার লেখা চিঠি পেত। প্রায় চার মাস হলো বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসছে না। পদ্মজা নয়টা চিঠি পাঠিয়েছে। একটারও উত্তর আসেনি। বাড়ির সবার কথা খুব মনে পড়ছে। ব্যালকনি ছেড়ে রুমে চলে আসে পদ্মজা। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে। হাওলাদার বাড়িতে টেলিফোন এনেছে। পূর্ণা হাওলাদার বাড়িতে এসে পদ্মজার সাথে যোগাযোগ করে। পদ্মজা কথা বলতেই ওপাশ থেকে পূর্ণার উল্লাস ভেসে আসল, 'আপা? আপা আমি তোমার গলার স্বর শুনতেছি। তুমি শুনছো?'

'শুনছি। কেমন আছিস? আম্মা কেমন আছে? বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'সবাই ভালো। তুমি কেমন আছো? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার গলার স্বর শুনছি!'

'আচ্ছা,শোন?'

'বলো আপা।'

'আশেপাশে কেউ আছে?'

'খালাম্মা আছে।'

'এই বাড়িতে আর আসবি না। আমি যতদিন না আসব। মনে রাখবি?'

'কেন? কেন আপা?'

'মানা করেছি,শুনবি।'

'আচ্ছা,কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এবার প্রতিদিন দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসব। আর তোমার সাথে কথা বলব। ধুর!'

'আবার যখন আসব আমাদের বাড়িতে টেলিফোন নিয়ে আসব। এরপর প্রতিদিন আমাদের কথা হবে। এখন আমার মানা শোন।'

'টাকা কই পাবে?'

'সেদিন উনি বলেছেন, নিয়ে আসবেন। আমি মানা করেছিলাম। বললেন, তুমি আনন্দে থাকলেই আমার সুখ। তোমার সুখের জন্যই এখন আমার সব। আর কী বলার?'

'দুলাভাই খুব ভালো তাই না আপা?'

Kobitor.com

'হুম। আম্মার শরীর সত্যি ভালো আছে?'

'আছে। আগের চেয়ে ভালো।'

'খেয়াল রাখিস আম্মার।'

'রাখব।'

বাতাসটা বেড়েছে। পদ্মজার গা কাঁটা দিচ্ছে। আচমকাই ঘুমটা ভেঙে যায়। চট করে উঠে বসে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল,টেলিফোন নেই। একদম বাস্তবের মতো অনুভূতি হচ্ছিল। পদ্মজা দেয়াল ঘড়িতে দেখে, এগারোটা বাজে। টেলিফোন পুরো দেশে হাতেগোনা কয়জনের বাসায় আছে। সেখানে গ্রামে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে ভাবা হাস্যকর।

পদ্মজা বিছানা ছেড়ে ড্রয়িংরুমে চলে আসে। কপালে হাত দিয়ে দেখে গায়ে জ্বর এসেছে।পূর্ণার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। রান্নাঘরে যেতে যেতে ডাকল,'মনা?'

পরক্ষণেই মনে পড়ল,মনা বাসায় নেই। দুইদিন আগে বাড়িতে গিয়েছে। খুব একা লাগছে তার। সবকিছুই রান্না করা আছে। আর কী রাঁধবে? এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া যায়। পদ্মজা এক কাপ চা নিয়ে ড্রয়িংরুমের জানালার পাশ ঘেঁষে বসল। গ্রামের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। মোর্শেদ প্রথম যেদিন সোয়েটার কিনে দিয়েছিলেন সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। সকাল সকাল উঠে খেজুরের রস দিয়ে পিঠা খাওয়া। কত লোভনীয় সেই দিনগুলো। কলিং বেল বেজে উঠল।

অসময়ে কলিং বেল শুনে পদ্মজা অবাক হলো। আমিরতো এখন আসবে না। দুই ঘন্টা আগেই বের হলো। তাহলে কে এসেছে? গায়ে শাল টেনে নিল সে। এরপর দরজা খুলল। দরজার সামনে আমির দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল,'এতো দ্রুত?'

'তৈরি হও,বাড়িতে যাব।'

পদ্মজা চোখের পলক ফেলে আবার তাকাল। বলল,'বাড়িতে মানে অলন্দপুর?'

আমির দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলল,'হুম। দ্রুত যাও। শাড়ি পাল্টাও।'

পদ্মজার উৎকণ্ঠা,'হুট করে যে! কোনো খারাপ খবর?'

আমির হেসে বলল,'তেমন কিছুই না। কয়দিন ধরে দেখছি মন খারাপ করে বসে থাকো। তাই হুট করে যাওয়ার কথা ভাবলাম। তোমার কলেজ তো শীতের বন্ধই আছে। আমি এক সপ্তাহর জন্য ম্যানেজারকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আলমগীর ভাইয়া এসেছে। কোনো চিন্তা নেই। এবার দ্রুত যাও। ট্রেন বারোটায়। আজকের শেষ ট্রেন কিন্তু এটাই। আমি তৈরি আছি। শুধু লাগেজে দুই তিনটা শার্ট ঢুকিয়ে নিলেই হবে।'

পদ্মজা আর কিছু বলল না। ছুটে যায় দুই তলায়। তার হৃৎপিণ্ড খুশিতে দামামা বাজাচ্ছে। দশ মিনিটের ব্যবধানে শাড়ি পাল্টে, লাগেজও গুছিয়ে ফেলে। দুজন বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্য অলন্দপুর। দীর্ঘ আট মাস পর জন্মস্থান, জন্মদাত্রী, জন্মদাতা,ভাই-বোন সবাইকে দেখতে পাবে পদ্মজা। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা এতোটাই কাজ করছে যে,শীতের প্রকোপ টের পাচ্ছে না সে।

কেবিনে ঢোকার পর থেকে বার বার এক কথাই বলে চলেছে পদ্মজা,'কতদিন পর যাচ্ছি! আম্মা হুট করে আমাকে দেখে জ্ঞান না হারিয়ে ফেলে। পূর্ণা নিশ্চিত জ্ঞান হারাবে।'

আমির হাসল। পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আসো গল্প করি।'

পদ্মজার তাকাল। তার চোখ দুটি হাসছে। চিকমিক করছে। সে প্রশ্ন করল,'আলমগীর ভাইয়া আমাদের বাসায়ই উঠবেন?'

'না। অফিসেই থাকবে।"

'রানি আপা ভালো আছে? কিছু বলছে?'

আমির চুল ঠিক করতে করতে ব্যথিত স্বরে বলল,'ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাচ্চা নষ্ট করতে দিল না। এরপর মৃত বাচ্চা জন্ম দিল। এখন অবস্থা আরো করুণ। ঘরেই বন্দী।'

'ইশ! খারাপ লাগে ভাবলে। মানুষের কপাল এতো খারাপ কী করে হয়!'

মোড়ল বাড়ির সড়ক দেখা যাচ্ছে। পদ্মজা খুশিতে আত্মহারা। দ্রুত হাঁটছে। সে কখনো বাহারি শাড়ি, বোরকা পরে না। আজ পরেছে। শাড়ি বোরকা দুটোতেই ভারী কাজ,চকচক করা ছোট-বড় পাথর।। দেখলে মনে হয়,হীরাপান্না চিকচিক করছে। সে তার মাকে দেখাতে চায়,সে কতোটা সুখী। কোনো কমতি নেই তার জীবনে। মোড়ল বাড়ির গেইট ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সব আনন্দ,উল্লাস নিভে যায়। পূর্ণা,প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকে চেনা যাচ্ছে না। শুকিয়ে কয়লা হয়ে গেছে।

চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গাল ভাঙা। গায়ে শুধু হাড্ডি। মনে হচ্ছে কতদিন অনাহারে কাটিয়েছে। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই 'আপা' বলে কেঁদে উঠল। ছুটে না এসে মাটিতে দপ করে শব্দ তুলে বসে পড়ল। প্রেমা দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে থাকল। পদ্মজা বাকরুদ্ধ। অজানা

আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ দুটো খুঁজতে থাকল মাকে। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের চোখ অস্থির। পদ্মজা প্রেমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আড়চোখে দেখে,পূর্ণা হাউমাউ করে কাঁদছে। কেন আসছে না ছুটে? কীসের এতো কষ্ট ওর?

পদ্মজা এগিয়ে আসে। পূর্ণাকে টেনে তুলে ক্ষীণ স্বরে বলল,'এতো শুকিয়েছিস কেন? আম্মা...আম্মা ভালো আছে?'

'আপা...আপারে।' বলে পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পূর্ণা। পদ্মজা ঘরের ভেতর তাকায়। কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। অজ্ঞাত ভয়ে গলা দিয়ে কথা আসছে না তার। পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর ঢুকল পদ্মজা। সদর ঘরে চেনা অনেকগুলো মুখ। প্রতিবেশী সবাই। আপন মানুষগুলো কোথায়? পদ্মজা আরো দুই পা এগিয়ে আসে। উঠান থেকে মনজুরার কণ্ঠ ভেসে আসে,'পদ্ম আইছে,পদ্ম...'

সদর ঘরের মধ্যখানে পাটিতে শুয়ে আছেন হেমলতা। গায়ের উপর কাঁথা। মেরুদণ্ড সোজা করে শুয়ে আছে। গোলাপজলের ঘ্রাণ চারপাশে। পদ্মজার বুকের হাড়গুলো যেন গুড়োগুড়ো হতে শুরু করল। বুকে এতো ব্যাথা হচ্ছে! সে হেমলতার পাশে বসল। নিস্তরঙ্গ গলায় ডাকল,'আম্মা? ও আম্মা?'

হেমলতা পিটপিট করে তাকান। চোখ দুটি ঘোলা। গাল ভেঙে গেছে। চোখ দুটি গভীর গর্তের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার পথে। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। চিনতে পারলেন না। পদ্মজা হেমলতার এক হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল। দুই ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে হেমলতার হাতে। তাতেও হেমলতার ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিজের মতো ঘরের ছাদে তাকিয়ে আছেন। মনজুরা সদর ঘরে ঢুকেই বিলাপ শুরু করেন মাত্র,পদ্মজা জোরে চেঁচিয়ে উঠল,'চুপ করো। কেউ কাঁদবে না। চুপ করো।'

সবার কান্না থেমে যায়। পদ্মজা হেমলতাকে বলল,'ও আম্মা? কথা বলো? আমি...আমি তোমার পদ্মজা। তোমার আদরের পদ্মজা।'

'আম্মা চারমাস ধরে কাউকে চিনে না আপা।' পূর্ণা ডুকরে কেঁদে উঠল। পদ্মজার চোখ পড়ে সদর ঘরের কোণে। মোর্শেদ কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না একদমই। পিঠের হাড্ডি ভেসে আছে। পদ্মজা বাকহীন হয়ে পড়েছে। কিছু বলবে নাকি কাঁদবে? বুকে কেমন যেন হচ্ছে! শরীরের শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। পদ্মজা দুই হাতে হেমলতার মাথা তুলে ধরল। হেমলতা তাকান। নিষ্প্রাণ চাহনী।

Kobitor.com

হেমলতার মাথাটা পদ্মজা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। আকুল ভরা কণ্ঠে বলল,একবার কথা বলো আম্মা? একবার দুই হাতে জড়িয়ে ধরো।'

হেমলতার হাত দুটো নেতিয়ে আছে মাটির উপর। পূর্ণা খেয়াল করে হেমলতার হাত দুটি কাঁপছে। চেষ্টা করছে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরার কিন্তু পারছেন না। তাহলে কী পদ্মজাকে চিনতে পেরেছেন? পদ্মজা কাঁদতে থাকল। অনেকে অনেক কিছু বলছে। কারো কথা কানে ঢুকছে না। শুধু বুঝতে পারছে,এই পৃথিবীর বুক থেকে তার মা হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে হেমলতা। হারিয়ে যাচ্ছে তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানী। স্বপ্ন তো সব পূরণ হয়নি! এ তো কথা ছিল না। তবে কেন এমন হচ্ছে? পদ্মজার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে। কাঁপা ঠোঁটে হেমলতার পুরো মুখে চুমু খেল পদ্মজা। ভারি করুণ ভাবে বলল,'ও আম্মা? কোথায় হারালো তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,ঝাঁঝালো কণ্ঠ?'

কেটে যায় অনেকটা মুহূর্ত। কাছের মানুষেরা ছাড়া আর কেউ নেই। কারো মুখে রা নেই। হেমলতার মতোই সবাই বাকহীন, স্তব্ধ। কেউ খায়নি। বাসন্তী গুপ্ত ব্যাথা নিয়ে রেঁধেছেন। প্রেমা-প্রান্ত,আমির ছাড়া কেউ খেল না। পদ্মজাকে অনেক জোরাজুরি করেছে আমির। পদ্মজা খেল না। আমিরও আর ঘাঁটল না। পদ্মজা জানতে পারল, দুই মাস ধরে হেমলতা বিছানায় পড়ে আছেন। এক দুটো কথা বলেন মাঝে মাঝে। চারদিন ধরে তাও বলেন না। গতকাল ভোরে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়েছে। এমন অবস্থা হয়েছিল, সবাই ভেবেছিল আত্মাটা বেরিয়েই যাবে। হাওলাদার বাড়ি থেকে সবাই দেখতে আসে। তখন জানা যায়,আলমগীর ঢাকা যাচ্ছে। মোর্শেদ অনুরোধ করে বলে,পদ্মজা আর আমিরকে খবর দিতে। ওরা যেন দ্রুত চলে আসে। রাতের ট্রেনে সকালে গোডাউনে পৌঁছে আলমগীর। আমিরকে সব বলে। আমির সব শুনে আর দেরি করেনি। পদ্মজাকে নিয়ে চলে আসে। পথে কান্নাকাটি করবে,তাই কিছু বলেনি। পদ্মজা এতসব জেনে কিছু বলল না। অভিমানের পাহাড় তৈরি হয়েছে মনে। কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। সারাক্ষন চেষ্টা করছে,হেমলতার সাথে কথা বলার। হেমলতা কিছুতেই কথা বলছেন না। একটু-আধটু পানির বেশি আর কিছুই খাচ্ছেন না। গায়ে মাংস বলতে নেই। চামড়া ঝুলে গেছে। পদ্মজা হেমলতার পুরো শরীর মুছে দিয়ে কাপড় পাল্টে দিল। এরপর শোয়া অবস্থায় অযু করাল। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে আরো একবার আকুতি করল,'একবার কথা বলো আম্মা। একবার ডাকো পদ্মজা বলে।'

হেমলতা তাকালেন। কিছু বললেন না। তাকিয়েই রইলেন। মাঝরাতে সবাই যখন ঘুমে,পদ্মজা জেগে। ক্লান্ত হয়ে সবার চোখ দুটি লেগে গেলেও,তার চোখ দুটি পলকও ফেলছে না। মনে হচ্ছে,কে যেন চারপাশে ঘুরছে তার মাকে নিয়ে যেতে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শেয়ালের হাঁক ছাপিয়ে সে যেন কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অবচেতন মন, আজরাইলের উপস্থিতি অনুভব করছে। পদ্মজার বুকে ভয় জেঁকে বসে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। এদিকওদিক তাকিয়ে কেঁদে অনুরোধ করে,'অনুরোধ করছি,আমার মাকে কষ্ট দিবেন না।'

মুখে হাত চেপে কান্না আটকানোর প্রচেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হতে থাকল পদ্মজা। কাঁদতে কাঁদতে কণ্ঠ নিভে এসেছে। ঠান্ডায় শরীর জমে গেছে। চোখটা লেগেছে মাত্র,তখনি দপদপ একটা শব্দ ভেসে আসে। পদ্মজা চমকে তাকাল। হেমলতা হাত দিয়ে মাটি থাপড়াচ্ছেন। শরীর কাঁপছে। পদ্মজার নিঃশ্বাস থেমে যায়। হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'আম্মা,আম্মা যেও না আমাকে ছেড়ে। ও আম্মা। আম্মা...আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? আম্মা পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে যেও না। আম্মা...আম্মা।'

পদ্মজা দ্রুত হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সবার ঘুম ছুটে যায়। একসাথে করুণ কান্নার স্বরে ভেসে উঠে মোড়ল বাড়ি। পদ্মজা কাউকে অনুরোধ করে বলে,'নিয়েন না আমার আম্মাকে। কষ্ট দিচ্ছেন কেন এতো? আমার আম্মার কষ্ট হচ্ছে। আম্মা। ও আম্মা। আম্মা আমাকে ছেড়ে যেও না।'

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে সূরা ইয়াসিন পড়া শুরু করল। হেমলতা শেষবারের মতো উচ্চারণ করেন,'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মাটা বেরিয়ে যায়। শরীরের কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। দেহটা শুধু পড়ে রয় পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো। পদ্মজা দেহটাকে খামচে জড়িয়ে ধরে আম্মা বলে চিৎকার করে উঠল। আশেপাশের সব বাড়ি থেকে মানুষ ছুটে আসে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারায়। ফজরের আযান পড়ছে। আমির পদ্মজাকে হেমলতার থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। কিছুতেই প্রাণ বিহীন দেহটা পদ্মজা ছাড়তে চাইল না। যেন তার ডাকেই ফিরে আসবে হেমলতা। এমন কী হতে পারে না? হেমলতা কথা বলে উঠলেন। আবার হাঁটলেন। পদ্মজাকে ধমকে বললেন,'চুপ! এতো কীসের কান্না? আমার মেয়ে হবে শক্ত আর কঠিন মনের। এতো নরম হলে চলবে না।'

এটা শুধুই কল্পনা। আত্মা একবার দেহ ছেড়ে দিলে আর ফিরে আসে না। আপন ঠিকানায় ফিরে যায়। হেমলতা নামে মানুষটার আয়ুকাল এতটুকুই ছিল। তিনি উড়াল দিয়েছেন পরকালে। রেখে গেছেন আদরের তিন কন্যা। আদরের কন্যাদের ছেড়ে তো কখনো দূরে থাকতে পারতেন না! এবার কীভাবে চলে গেলেন? তিনি নিশ্চয় মৃত্যুর সাথে কঠিন যুদ্ধ করেছেন! পেরে উঠেননি।

ভোরের আলো ফুটতেই পদ্মজা নিজেকে শক্ত করল। গোসল করে এসে কোরআন শরীফ নিয়ে বসল। হেমলতা বলতেন,'মা-বাবা মারা গেলে কান্নাকাটি না করে লাশের পাশে বসে কোরআান শরীফ পড়া ভালো। এতে করে কবরে আযাব থাকলে কম হয়। (এই কথার কোনো সত্যতা নেই। তবে অনেক গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।)

সে প্রতিটা অক্ষর পড়ছে আর কাঁদছে। জীবনের আকাশের সাতরঙা রংধনু নিভে গেছে। আর কখনো উঠবে না। কোনোদিন না। মোর্শেদ পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখের জল মুছছেন। আবার ভিজে যাচ্ছে। গোসলের পর হেমলতার মুখটা উজ্জ্বল হয়েছে। ঠোঁটের কোণে যেন হাসি লেগে আছে। পদ্মজা হেমলতার মৃত দেহের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাদা কাপড়ে মোড়ানো লম্বা দেহটা দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,'আমি জানি,তোমার রুহ আমার পাশেই আছে। এভাবে কথা না ভাঙলেও পারতে আম্মা। বলেছিলে, কখনো কিছু লুকোবে না! বেহেশতে ভালো থেকো আম্মা। আমি পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্তকে দেখে রাখব।'

এরপর হাটুভেঙে খাঁটিয়ার সামনে বসল। হেমলতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,'আল্লাহকে বলে খুব দ্রুত আমাকে নিতে এসো কিন্তু।'

আমির,হিমেল সহ আরো দুইজন খাঁটিয়া কাঁধে তুলে নিল। কালিমা শাহাদাত বলতে বলতে তারা সামনে এগোয়। পূর্ণাকে তিনজন মহিলা ধরে রেখেছে। সে হাত পা দিয়ে ঝাঁপিয়ে চেষ্টা করছে ছোটার। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃত দেহটাই আঁকড়ে ধরে রাখতে। পদ্মজা মাটিতে বসে পড়ে। কী যেন বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! আম্মা...আম্মা বলে দুই হাতে মাটি খামচে ধরে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, বিড়বিড় করে,'আমার আম্মাকে কষ্ট দিও না মাটি। একটুও কষ্ট দিও না। আমার আম্মাকে যত্নে রেখ। হীরের টুকরো তোমার বুকে ঘুমাতে যাচ্ছে। কষ্ট দিও না...কষ্ট দিও না।'

____

হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপছে পদ্মজা। সন্ধ্যে থেকে খুব ঠান্ডা পড়েছে। এক কাপড়ে মাটিতে মা একা আছে ভেবে পদ্মজার অশান্তি হচ্ছিল। তাই কম্বল নিয়ে রাতের বেলা ছুটে আসে মায়ের কবরে। সদ্য হওয়া কবরের কাঁচা মাটির ঘ্রাণ আসছে। পদ্মজা কম্বল দিয়ে মায়ের কবর ঢেকে দিল।এরপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আম্মা...মনে আছে তোমার? যখন আমি ছোট অনেক। আব্বা আমার গায়ের কম্বল নিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি তোমার শাড়ির আঁচল দিয়ে সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলে? মনে আছে? আমাকে কেন সেই সুযোগ দিলে না? কেন বললে না,তুমি মরণ রোগে আক্রান্ত। আমার জীবনে অভিশপ্ত আক্ষেপ কেন দিয়ে গেলে আম্মা? কেন পেলাম না আমার মাকে সন্তানের মতো আদর করার সুযোগ ? কোন দোষে আমার সঙ্গ তুমি নিলে না?

মৃত্যুর আগে নিজের মেয়ের সাথে এতো বড় অনাচার করে গেলে আম্মা! বিশ্বাসঘাতকতা করলে। আমিতো তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতাম। কখনো কোনো বিষয়ে জোর করিনি। জোর করে জানতে চাইনি। আমি বিশ্বাস করতাম তুমি সব বলবে আমায়। তুমি নিজে আমাকে বার বার বলেছো,তোমার জীবনের এক বিন্দু অংশ থাকবে না যা আমাকে বলবে না। তবে কেন সেই কথা রাখতে পারলে না? আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তুমি অনুভব করছো? আমি তোমার বুকে শুয়ে অভিযোগ তুলছি, তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

করেছো! আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো দশ মাস। তুমি পারতে,আমাকে বলতে। তুমি পারতে আমাকে বিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রাখতে। তুমি পারতে আমাকে আরো দশ মাস আমার মায়ের সঙ্গ দিতে। আমি এতো আক্ষেপ নিয়ে কী করে বাঁচবো আম্মা?'

কয়েকটা শেয়াল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝরাতে কবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কাঁদতে পারে,এমন হয়তো কখনো দেখেনি তারা। পদ্মজা হেমলতার কবরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর অশ্রু বিসর্জন করছে। আত্মহত্যা পাপ না হলে হয়তো এই পথই বেছে নিত সে। মোর্শেদ,আমির টর্চ নিয়ে পদ্মজাকে খুঁজতে খুঁজতে কবরে আসে। হেমলতার কবর দেখে মোর্শেদ দূর্বল হয়ে পড়েন। পদ্মজার সাথে সাথে তিনিও কাঁদতে থাকেন। আমিরের শব্দভান্ডারে স্বান্ত্বনা মজুদ নেই। সে সাহস করতে পারল না কথা বলার। কান্না থামিয়ে পদ্মজা মুখস্থ সূরা ইয়াসিন পড়তে থাকল। সে চায় না তার মায়ের বিন্দুমাত্র কষ্ট হউক কবরে। সন্তানের আমল নাকি পারে,মৃত মা-বাবার শাস্তি কমাতে। যদি কোনো পাপের শাস্তি হেমলতার আমলনামায় থেকে থাকে তা যেন মুছে যায় পদ্মজার কণ্ঠের মধুর স্বরে। ধীরে ধীরে পদ্মজার কণ্ঠ কমে আসে। ঠান্ডায় জমে যায়। চোখের মণির রং পাল্টে যায়। আমির দ্রুত পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। এরপর মোর্শেদকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। হেমলতা পড়ে রইলেন একা একা। শেয়ালগুলি একসাথে চেঁচিয়ে উঠল। মৃত্যুর মতো সত্য আর নেই। জন্মালে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতেই হবে।

____

হেমলতার ঘরে পদ্মজা আর পূর্ণা বসে আছে, দরজা বন্ধ করে। পুরো বিছানা জুড়ে হেমলতার পরনের কাপড়চোপড়। এসবই শেষ স্মৃতি। পূর্ণা দুটো শাড়ি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা মাটিতে বসে আছে। উসকোখুসকো চুল। পূর্ণা আর কাঁদতে পারছে না। বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও শব্দ বেরোচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে বলল,'আম্মা বলে এখন কাকে ডাকব? পূর্ণা আমাদের আম্মা কই গেলো?'

পূর্ণা বিছানা থেকে নেমে আসে। পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা স্বরে বলল,'আল্লাহ কেন এমন করলো আপা? আমাদের প্রতি একটু দয়া হলো না।'

'এই ঘরটায় আর আসবে না আম্মা!'

'আপা,আম্মা আসে না কেন? আপা...আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাকে মেরে ফেলো।'

'কাঁদিস না বোন। আমাদের সবার আবার দেখা হবে পরকালে। এরপর আর মৃত্যু নেই। অনন্তকাল একসাথে থাকব। ঠিক দেখা হবে।'

পালঙ্কের উপর একটা পুরনো খাতা। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে নিল। পূর্ণা এই খাতার প্রতিটি অক্ষর আগেই পড়েছে। তাই আর ঘাঁটল না। সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা খাতার পৃষ্ঠা উল্টায়,

আমার আদরের পদ্মজা,

আজ পনেরো দিন তোর বিয়ের। প্রতিটা রাত আমার নির্ঘুমে কাটে। পুরো বাড়িজুড়ে তোর স্মৃতি। স্মৃতিগুলো আমায় বিষে জর্জরিত করে দেয়। মেয়ে হয়ে জন্মালে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। তবুও মানতে কষ্ট হচ্ছে,আমার মেয়ে সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে গিয়েছে। বলেছিলাম,আমার জীবনের বিন্দুমাত্র অংশ তোর অজানায় রাখব না। সেই কথা রাখতে আমি লিখতে বসেছি। স্বপ্ন ছিল,তোকে অনেক পড়াব। অনেক...অনেকদিন নিজের কাছে রাখব। কিন্তু মানুষের সব স্বপ্ন কী পূরণ হয়? দীর্ঘ দুই বছর আমার শরীরে বাসা বেঁধে ছিল এক রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু পাত্তা দেইনি। যখন তোর মেট্রিক পরীক্ষার জন্য আকবর ভাইজানের বাড়িতে গেলাম তখন একজন ভালো ডাক্তারের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আকবর ভাইজানের বন্ধু। দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তুই পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিলি। উনার নাম আসাদুল জামান। বিলেত ফেরত ডাক্তার। কথায় কথায় আমার সমস্যাগুলোর কথা বলি। তিনি খালি চোখে আমাকে দেখেন। কিছু প্রশ্ন করেন। উনার ধারণা জানান, আমি পারকিনসন্স ডিজিস নামক প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। যার ৮০ ভাগ লক্ষণ আমার সাথে মিলে যায়। তিনি দ্রুত আমাকে পরীক্ষা করতে বলেন। এই রোগের চিকিৎসা তো দূরে থাক দেশে এই রোগ পরীক্ষার কেন্দ্রও হাতেগোনা ১-২ টা আছে। সেদিনটা আমার জীবনের বড় ধাক্কা ছিল। আমি দিকদিশা হারিয়ে ফেলি। আমি মারা গেলে আমার তিন মেয়ের কী হবে? কী করে বাঁচবে? ভয়ানক এই রোগ নিয়ে তোর সামনে হাসতে আমার ভীষণ কষ্ট হতো। তবুও হাসতে হতো। মুহিব খুব ভালো ছেলে। তাই তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেইনি। আমি মারা যাওয়ার আগে তোর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। বিয়ে ঠিক করে ফিরে আসি গ্রামে। প্রতিটা দিন,প্রতিটা মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রনায় কাটতে থাকে। আসাদুল জামান ঢাকার এক হাসপাতালের নাম লিখে দিয়েছিলেন। যেখানে এই রোগের পরীক্ষা করা হয়। ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করানোটা জরুরি। তার জন্য কেউ একজনকে দরকার পাশে। তোর আব্বাকে সব বলি। সব শুনে তোর আব্বা হাউমাউ করে বাচ্চাদের মতো কেঁদেছে! আল্লাহর উপর ভরসা রেখে,চলে যাই ঢাকা। আমি তখন হুঁশে ছিলাম না। মৃত্যু আমার পিছনে ধাওয়া করছিল। তাই মাথায় আসেনি,আমি না থাকলে আমার মেয়েদের কোনো ক্ষতি হতে পারে। ঢাকা যাওয়ার পথে আল্লাহর কাছে আকুতি করি,যেন পরীক্ষায় কিছু ধরা না পড়ে। বিয়েটা ভেঙে দিতে পারি। আর আমার মেয়েদেরকে নিয়ে আরো কয়টা বছর বাঁচতে পারি। কিন্তু আল্লাহ শুনলেন না। তিনি দয়া করলেন না মা! জানতে পারি,আমার হাতে সময় কম। এ রোগের নিরাময় নেই। যেকোনো বছরে যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। এই কথা শোনা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোদের কথা মনে পড়তেই আবার নিজেকে শক্ত করে নিয়েছি। যতদিন বাঁচব শক্ত হয়ে বাঁচব। তোর জীবন গুছিয়ে দিয়ে যাব। আমি পেরেছি। তোর বিয়ে হয়েছে। ভালো ছেলের সাথে। সুখে আছিস। এইতো শান্তি। আমার ভাবতে কষ্ট হয়, একদিন তোকে, তোদের সবাইকে আমি ভুলে যাব। এখন তো কথা ভুলে যাই। তখন নিজের নাড়ি ছেড়া সন্তানদের মুখও অচেনা হয়ে যাবে। কী নির্মম তাই না মা?

Kobitor.com

তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস অনেকদিন হলো। আমার মনে হচ্ছে,আমাদের আর দেখা হবে না। আমার শরীরের অবস্থা ভালো না। আজ নাকি প্রান্তকে চিনতে পারিনি আমি। বেশ অনেক্ষণ ওর চেহারাটা আমার অচেনা লেগেছে। কী অদ্ভুত! ভুলে যেয়ে আবার মনে পড়ে। হাত, পা, মাথা মুখের থুতনি, চোয়াল মাঝে মাঝে খুব কাঁপে। ধীরে ধীরে শরীরের ভারসাম্য একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম,হুট করে চৌকির উপর থেকে পড়ে গিয়েছি। পূর্ণার সে কী কান্না! মেয়েটা খুব কাঁদুনে হয়েছে। একদমই হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শক্তি কুলোয় না। তোর কথা খুব মনে পড়ে। বৃদ্ধ হয়ে তোর শরীরে ভর দিয়ে হাঁটার ইচ্ছে ছিল মনে। পেটের চামড়ার ফোস্কার মতো কী যেন হয়েছে। চুলকায়, ব্যাথা করে। রাতে ঘুম হয় না যন্ত্রনায়। তোর আব্বা আমার অশান্তি দেখে ঘুমাতে পারে না। বাসন্তী আপা সব জানে। মানুষটা অনেক ভালো। ভুল তো সবাই করে। এমন কেউ আছে? যে জীবনে ভুল করেনি। বাসন্তী আপার রান্না নাকি অনেক মজার হয়। খুব ভালো ঘ্রাণ হয়। প্রান্ত,প্রেমা সারাক্ষণই বলে। কিন্তু আমি সেই ঘ্রাণ পাই না। ঘ্রাণশক্তিটাও লুপ্ত হয়ে গেছে। কয়দিন ধরে টয়লেটও হচ্ছে না। খাবার গিলতে পারি না। কোন পাপে এমন করুণ দশা হলো আমার? বোধহয়, আর শক্তি পাবো না লেখার। পুরনো সবকিছু স্থায়ীভাবে ভুলতে আর কতক্ষণ? সব লক্ষণ তো জেঁকেই বসেছে শরীরে। বাকি শুধু দুনিয়াটাকে ভুলে যাওয়া। আজ সারারাত জেগে আরো কিছু কথা লিখতে চাই। সেদিন আমি জলিল আর মজনুর ছেলেকে খুন করেছি। ছইদ তার আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল। আটপাড়ার বড় বিলের হাওড়ের টিনের ঘরে ওরা তিনজন সবসময় জুয়া খেলে,গাঁজা খায়। সেদিনও গাঁজা খেয়ে পড়েছিল। গিয়ে দেখি ছইদের লাশ এক কোণে পড়ে আছে। দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে তোর দেবর রিদওয়ান। ও আমাকে দেখে পালিয়ে যায়। এরকম দৃশ্য দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি তবুও থেমে থাকিনি। ঘুমন্ত জলিল আর মজনুর ছেলেকে বেঁধে....। বাকিটুকু বললাম না। শুধু এইটুকু বলব, আমি যখন জলিল আর মজনুর ছেলেকে কোপাচ্ছিলাম তখন রিদওয়ান ঘরের এক পাশে লুকিয়ে ছিল। সে সব দেখেছে। আমি বের হতেই সে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করে। আজও জানতে পারিনি,সে কেন ছইদকে খুন করেছে। তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস ভেবে শান্তি লাগছে। রিদওয়ান ভয়ংকর মানুষ। তার খুন করার হাত বলছে,এটা তার প্রথম খুন নয়। সাবধানে থাকবি। আমিরকে সাবধানে রাখবি। তোর শ্বাশুড়িকে কাঁদতে দেখেছি। উনাকে আপন করে রাখবি।

আর লেখা যাচ্ছে না। হাত কাঁপছে। কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিক। এই খাতাটা প্রান্তের। লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। আমার সব শাড়ির সাথে ট্রাঙ্কের ভেতর যত্নে রাখছি। আমার অনুপস্থিতিতে যখন পড়বি কাঁদবি না একদম। জীবনে বড় হবি। আমি না থাকলে মৃত্যুর কামনা করবি না। এটাও এক ধরণের পাপ। আল্লাহর যখন ইচ্ছে হবে মৃত্যু দিবেন। তিনি যে কারণে সৃষ্টি করেছেন,তা পূরণ হলেই মৃত্যু ধেয়ে আসবে। শুধু মৃত্যুর কথা স্বরণ রাখবি। কোরআনের পথে চলবি। কোনো পাপে জড়াবি না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবি না। আমাদের আবার দেখা হবে। আমার মায়ের সাথে আবার দেখা হবে। তুইতো আমার মা। আমার পদ্মজা। আমার সাত রাজার ধন। আমার তিন কন্যা আমার অহংকার। আমার বেহেশত। ভালো থাকবি। খুব ভালো থাকবি। মা কিন্তু দেখব। কান্নাকাটি করতে দেখলে ওপারে আমার শান্তি হবে না। তাই কাঁদবি না। আল্লাহ হাফেজ।'

পড়া শেষ হতেই খাতাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে পদ্মজা। হাতপা ছুঁড়ে আম্মা,আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। তার আর্তনাদে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে যায়।

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

....

পদ্মজার মাথার ছায়া এভাবেই হারিয়ে যায়। পদ্মজা কী হয়ে উঠতে পারে নিজের ছায়া নিজে? পারবে ভাই-বোনদের আগলে রাখতে? বাকি রহস্যের কিনারায় পৌঁছাতে? সব প্রশ্নের উত্তর আছে দ্বিতীয় খন্ডে। খুব দ্রুত নিয়ে আসব ২য় খন্ড। গ্রুপে(Elma's manuscripts) জানিয়ে দেব কবে আসবে আমি পদ্মজার পরবর্তী খন্ড। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে। নিজের দায়িত্ব নিজের। ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য হেমলতা হয়ে উঠুন। অস্থায়ী সময়ের জন্য বিদায়।

]

আমি পদ্মজা - ৪৬

____

১৯৯৬ সাল। ঘনকুয়াশার ধবল চাদর সরিয়ে প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁচের জানালার পর্দা সরাতেই এক টুকরো মিষ্টি পেলব রোদ্দুর পদ্মজার সুন্দর মুখশ্রীতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নীচ তলা থেকে মনার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আপামনি।'

মিষ্টি রোদের কোমল ছোঁয়া ত্যাগ করে ঘুরে দাঁড়াল পদ্মজা। আমির আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে লেপের ওম ছেড়ে উঠে বসল। দরজার বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল পদ্মজাকে। ধনুকের মতো বাঁকা শরীরে সবুজ সুতি শাড়ি। মাথায় লম্বা বেনুনি, চওড়া পিঠের ওপরে সাপের মতন দুলছে। পাতলা কোমর উন্মুক্ত। আমির চমৎকার করে হেসে ডাকল,'পদ্মবতী।'

পদ্মজা ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিল,'অপেক্ষা করুন,আসছি।'

আমির মুখ গুমট করে বলল,'ইদানীং আমাকে একদমই পাত্তা দিচ্ছো না তুমি। বুড়ো হয়ে গেছি তো।'

ওপাশ থেকে আর সাড়া আসল না। আমির অলস শরীর টেনে নিয়ে বারান্দায় গেল। পদ্মজা বৈঠকখানায় এসে দেখে,মনা সোফায় পানের কৌটা নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। নয় বছরের মনা এখন চৌদ্দ বছরের ছটফটে কিশোরী। পদ্মজা গম্ভীর স্বরে বলল,' পান খাওয়ার অনুমতির জন্য ডেকেছিস?'

মনা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নত অবস্থায় রেখেই চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে পদ্মজাকে দেখল একবার। এরপর আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,'অনেকদিন খাই না। আপামনি একটা খেতে দাও না?'

মনা চাইলে লুকিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু সে পদ্মজাকে ডেকে অনুমতি চাইছে। পদ্মজা মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। সোফায় বসে প্রশ্ন করল,'পান কে দিয়েছে? আবার সাথে পানের কৌটাও!'

'আব্বা আসছিল।' ভীতু কণ্ঠে বলল মনা।

'কখন?'

'ভোরবেলা।'

'বাসায় আসেনি কেন?'

'কাজে যাচ্ছে তাই।'

'উনি এমনি এমনি কেন আনবেন পানের কৌটা? তুই স্কুল থেকে ফেরার পথে বস্তিতে গিয়েছিলি, তাই না?'

মনা জবাব দিল না। তার চুপ থাকা প্রমাণ করছে,পদ্মজার ধারণা সত্য। পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বলল,'একটা পান খাবি। কৌটাসহ বাকি পান,সুপারি রহমত চাচাকে দিয়ে তোদের বস্তিতে পাঠিয়ে দেব।'

পদ্মজা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,'তুই নাকি গণিতে ফেইল করেছিস?'

পদ্মজার প্রশ্নে মনা চোরের মতো এদিকওদিক চোখের দৃষ্টি দৌড়াতে থাকল। পদ্মজা ধমকে উঠল,'বলছিস না কেন? আমি প্রতিদিন রাতে সময় নিয়ে তোকে গণিত বুঝিয়েছি। তবুও ফেইল করলি কী করে?'

মনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'পরীক্ষার আগের দিন পড়িনি। পরীক্ষায় গিয়ে সব ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছিল।'

'কেন পড়িসনি? সেদিন আমি অসুস্থ ছিলাম না? তাই আমি দুই তলায় ছিলাম নিচে একবারও আসতে পারিনি। এই সুযোগে পড়া রেখে টিভি দেখেছিলি তাই তো?'

মনা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। পদ্মজা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। বেহায়ার মতো আবার স্বীকারও করছে,পড়া রেখে টিভি দেখেছে! ঢাকা আসার পরের বছরই মনাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল সে। এখন মনা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মাথায় বুদ্ধি বলতে নেই। সারাক্ষণ টিভি, টিভি আর টিভি! এতো পড়ানোর পরও কিছু মাথায় রাখতে পারে না। পদ্মজা বিরক্তি নিয়ে জায়গা ছাড়ল। শোবার ঘরে ঢুকতেই আমির আক্রমণ করে বসল। পদ্মজার কোমরের উন্মুক্ত অংশে হাত রাখতেই পদ্মজা 'উফ! ঠান্ডা।' বলে ছিটকে সরে গেল। আমির হতভম্ব হয়ে গেল। দুই পা এগোতেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রিনরিনে কণ্ঠে ধমক বেরিয়ে আসল,'একদম এগোবেন না। এই শীতের মধ্যে ভেজা হাতে ছুঁলেন কীভাবে? আচ্ছা,আপনি আমার কালো সোয়েটারটা দেখেছেন? পাচ্ছি না। শীতে জমে যাচ্ছি একদম।'

আমির কিছু বলল না। সে পদ্মজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা এদিকওদিক তার কালো সোয়েটারটা খুঁজল। এরপর আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। বলল,'এভাবে সঙের মতো খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

আমির কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। পদ্মজা পাশের ঘরে চলে গেল। কালো সোয়েটারটা খুঁজে বের করতেই হবে। এ সোয়েটারটা পরে সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমির টেলিফোন রেখে পদ্মজাকে ডেকে জানাল, সে বের হবে। জরুরি দরকার। পদ্মজা সোয়েটার খোঁজা রেখে তাড়াতাড়ি করে খাবার পরিবেশন করল। গরুর মাংস গরম করল। আমির খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিয়মমতো পদ্মজার কপালে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল। পদ্মজা তৈরি হয় রোকেয়া হলে যাওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে রোকেয়া হলের অনেক মেয়েকেই চিনে। আজ মনার স্কুল নেই। সে একাই বাসায় থাকবে। পদ্মজা হলে যাচ্ছে এক ছোট বোনের সাথে দেখা করার জন্য। আমিরের তো কখনোই ছুটি নেই। নিজের ব্যবসা। যখন তখন কাজ পড়ে যায়।

রোকেয়া হলের চারপাশ সবুজ গাছে আবৃত। পদ্মজা গেইটের বাইরে গাড়ি রেখে এসেছে। হিম শীতল বাতাসে চোখজোড়া ঠান্ডায় জ্বলছে। তার পরনে বোরকা। মুখে নিকাব। রোকেয়া হলের 'ক' ভবনে এসে জানতে পারল যার খুঁজে সে এসেছে সে নেই। চারিদিক নিরিবিলি। প্রায় সবাই ক্যাম্পাসে। নির্জন পরিবেশে এমন ঠান্ডা বাতাস রোমাঞ্চকর অনুভূতি। রোকেয়া হলে এ নিয়ে অনেকবার এসেছে সে। পদ্মজা 'ক' ভবনের নিচ তলার শেষ মাথার কাছাকাছি অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তখন অতি সূক্ষ্ম একটা শব্দ কানে ভেসে আসে। পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। দুই পা পিছিয়ে চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করল। শব্দটা তীব্র হয়েছে! যেন কাছে কোথাও ধস্তাধস্তি হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকায়। একটা মেয়ের চাপা কান্নার শব্দ কর্ণকুহরে পৌঁছাতেই পদ্মজা দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো ছুটে আসে শেষ কক্ষের দরজার সামনে। পৌঁছেই দেখতে পেল অর্জুন এবং রাজু একটা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে কক্ষ থেকে বের করতে চাইছে। ক্যাম্পাসের ছাত্রসংগঠনের নেতা এরা। ছয় মাস হলো ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে এসেছে। আর এখনই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছে। পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে অর্জুন,রাজু তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। পদ্মজাকে দেখে মেয়েটা ছুটে আসতে চাইলে অর্জুন ধরে ফেলে। পদ্মজা বেশ শান্তভাবেই বলল,'ক্ষমতার অপব্যবহার করতে নেই। ছেড়ে দাও মেয়েটাকে।'

পদ্মজার কণ্ঠ মেয়েটা চিনতে পারল। অস্ফুটভাবে ডাকল,'পদ্ম আপা।'

এরপর বলল,'পদ্ম আপা,আমি মিঠি। পদ্ম আপা ওরা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।'

পদ্মজা ভালো করে খেয়াল করে চিনতে পারল মিঠিকে। অর্জুন মিঠির গালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মেরে রাজুকে বলল,'এরে ঘাড়ে উঠা। এই আপনি সরেন। মাঝে হাত ঢুকাবেন না। বিরক্ত করা একদম পছন্দ না আমার।'

পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল,'দেখো, মা জাতিকে এভাবে অপমান করতে নেই। হাতে ক্ষমতা পেয়েছো সৎভাবে চলো। সবার ভালোবাসা পাবে। এভাবে নিজেরা অন্যের ইজ্জত নষ্ট করছো সেই সাথে নিজেদের পাপী করছো।'

Kobitor.com

'এই ফুট এখান থেকে। নীতি কথা শোনাতে আসছে।'

'ভালোভাবে বলছি,ভেজাল না করে ছেড়ে দাও। নারীকে নারীরূপে থাকতে দাও। শক্ত হতে বাধ্য করো না।'

অর্জুন রাগে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলল,'আর একটা কথা বললে জামাকাপড় খুলে মাঠে ছেড়ে দেব।'

কথাটা শেষ করে অর্জুন চোখের পলক ফেলতে পারল না। তার আগে পদ্মজার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় তার ফর্সা গালে। অর্জুন রক্তিম চোখে কিড়মিড় করে তাকায়। মিঠিকে ছেড়ে পদ্মজার গলায় চেপে ধরে। পদ্মজা সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। অর্জুন কোঁকিয়ে উঠল। অণ্ডকোষে দুই হাত রেখে বসে পড়ল। রাজু বিশ্রি গালিগালাজ করে পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে। পদ্মজা মেঝে থেকে ইট তুলে রাজুর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। মিঠি ভয়ে চোখ খিঁচে ফেলে। রাজুর কপাল ফেটে রক্তের ধারা নামে। অর্জুন আকস্মিক তেড়ে এসে পদ্মজার নিকাব টেনে খুলে। ঘোলা চোখের ভয়ংকর চাহনি,রক্তজবার মতো ঠোঁটের কাঁপুনি অর্জুনের অন্তর কাঁপিয়ে তুলে। তবুও দমে থাকেনি। পদ্মজাকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। পদ্মজা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে অর্জুনের গলায় টান বসায়। এই দৃশ্য দেখে মিঠির শরীর কাঁপতে থাকে। অর্জুন চিৎকার করে বসে পড়ে। গলায় হাত দিয়ে দেখে গলাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। চামড়া ছিঁড়েছে শুধু। তার হৃৎপিণ্ড যেন মাত্রই মৃত্যু সাক্ষাৎ পেল। পদ্মজার অভিজ্ঞ হাত তার কলিজা শুকিয়ে দিয়েছে। মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা ছুরির রক্ত অর্জুনের গেঞ্জিতে মুছে বলল,'তোমাদের ভাগ্য ভালো পদ্মজার হাতে পড়েছো। হেমলতার হাতে পড়োনি।'

এরপর মিঠিকে প্রশ্ন করল,'আমার জানামতে তুমি ১ম বর্ষে আছো। আর হলে দ্বিতীয় তলায় থাকার কথা। এখানে আসলে কী করে?'

মিঠির ভয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল,'আমি গত কয়দিন অসুস্থ ছিলাম। ক্যাম্পাসে যেতে পারিনি। অর্জুন দাদা নাজমাকে দিয়ে আমাকে ডেকেছিল।'

'ওমনি চলে এসেছো? কয়দিন আগে ৩য় বর্ষের একটা মেয়ের কী হাল হয়েছে দেখোনি,শুনোনি? এরপরও এদের ডাকে সাড়া দিলে কেন?'

'না দিয়েও উপায় নাই।'

পদ্মজা আর কিছু বলতে পারল না। মিঠিকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর নিকাব পরতে পরতে বলল,'এসব বেশিদিন সহ্য করা যায় না। মেয়েরা হলে এসে থাকে পড়াশোনার জন্য। আর এসব নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। তোমার চেনাজানা আরো যারা মানসিক,শারিরীকভাবে ভুক্তভোগী আছে সবার নামের তালিকা আমাকে দিতে পারবে?'

মিঠি জানতে চাইল,'কেন?

kobitor.com

'সবাইকে নিয়ে প্রশাসনের কাছে যাব। তাদের নিরবতা আর মেনে নেব না। ক্যাম্পাসে আসার পর থেকে নেতাদের অপকর্ম দেখছি। থামানোর চেষ্টা করেছি। একজন,দুজন থামে আরো দশজন বাড়ে। এইবার আমাদের আন্দোলন করতে হবে।'

মিঠি মিনমিনিয়ে বলল,'কেউ ভয়ে আন্দোলন করতে চায় না। অনেকবার দিন তারিখ ঠিক হয়েছে শুনেছি। এরপর যাদের আসার কথা ছিল তাদের মধ্যে আশি ভাগই আসতো না। অনেককে বাসায় আক্রমণ করা হয়েছে।'

পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজে মেয়েরা এতো দূর্বল! তাদের দেহের লুকায়িত আকর্ষণীয় ছন্দগুলো না থাকলে হয়তো তারাও সাহসী হতো। ছন্দ হারানোর ভয় থাকত না। কাউকে ভয় পেতে হতো না। পদ্মজা মিঠিকে বলল,'তুমি বরং কয়দিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসো। এখানে থাকা তোমার জন্য এখন বিপদজনক। আমি আগামীকাল গ্রামে যাচ্ছি। আমার আম্মার মৃত্যুবার্ষিকী। ছোট বোনের মেট্রিক পরীক্ষা দেড় মাস পর। আরেক বোনের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। দেড়-দুই মাসের মতো গ্রামে থাকব। এরপর এসে এই নেতাদের ব্যবস্থা করব। তোমাদের বর্ষের শিখা আছে না? বেশ সাহসী মেয়েটা। ওর মতো আরো কয়টা মেয়ে পাশে থাকলেই হবে। তুমি যাও এখন। দ্রুত বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো। যতক্ষণ এখানে আছো একা চলাফেরা করো না। শিখাও তো মনে হয় হলেই থাকে?'

'জি।'

'ওর সাথে থেকো।'

'কখনো কথা হয়নি।'

'এখনতো ক্যাম্পাসে বোধহয়। আচ্ছা বিকেলে আমি আবার আসব। ওর সাথে কথা বলব। আমি আসছি এখন।'

'পদ্ম আপা?'

পদ্মজা তাকাল। মিঠি পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ভেজাকণ্ঠে বলল,'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'বাঁচার সংগ্রামে ভীতু হলে চলে না মিঠি।'

'ভেবেছিলাম জীবনটা শেষ হয়েই গেল বুঝি।'

'কখনো এমন ভাববে না। বিপদে সামর্থ্য মতো যা পারো করবে। শরীরের শক্তি নিশ্চয় কম নয়। মনের জোরটা কম। সেই জোরটা বাড়াবে। মনের জোর বাড়াতে টাকা লাগে না। কঠিন জীবন সহজ করে তোলার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়।'

মিঠি মাথা তুলে তাকাল। একটু সরে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল। এরপর বলল,'দ্রুত ফিরবে পদ্ম আপা। আমরা আমাদের নিরাপত্তার যুদ্ধে নামব।'

পদ্মজা হেসে বলল,'ফিরব। দ্রুত ফিরব।'

Kobitor.com

গাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছে। বাড়ির নাম আগে ছিল,আমির ভিলা। বছর ঘুরতেই আমির বাড়ির নাম পাল্টে দিল,পদ্ম নীড়। পদ্মজা জানালার কাচ তুলে বাইরে তাকাল। রাস্তাঘাটে মানুষজন কম। ঠান্ডা বাতাস। সূর্যের আলোয় একদমই তেজ নেই। যেন থুড়থুড়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। পদ্মজা আকাশপানে তাকিয়ে তিনটা প্রিয় মুখকে খোঁজে। চোখ দুটি টলমল করে উঠে। কোথায় আছে তারা? আবার কবে হবে দেখা? পদ্মজা কাচ নামিয়ে দিল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

____

নিস্তব্ধ বিকেল ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে অলন্দপুরের আটপাড়া। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় নূপুরধ্বনিতে। পূর্ণার চঞ্চল কাদামাখা দুটি পা দৌড়ে ঢুকে মোড়ল বাড়ি। পায়ের নূপুরজোড়া রিনঝিন রিনঝিন সুর তুলে ছন্দে মেতেছে। পরনে লাল টুকটুকে শাড়ি। আঁচল কোমরে গোঁজা। শাড়ি গোড়ালির অনেক উপরে পরেছে। । বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠল,'বড় আম্মা। ও বড় আম্মা।'

বাসন্তী রান্নাঘর ছেড়ে দৌড়ে আসেন। হাতের চুড়িগুলো ঝনঝন করে উঠে। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। তাও কিঞ্চিৎ। পূর্ণাকে এভাবে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করলেন,'বাড়িতে ডাকাত পরছে?'

'আপার চিঠি।' পূর্ণা হাতের খামটা দেখিয়ে বলল।

আপার চিঠি শুনে প্রেমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সে পড়ছিল। ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা। ষোড়শী মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সবার চেয়ে আলাদা হয়েছে। খুব ভীতু এবং লাজুক সে। পূর্ণা বড় বোন হয়ে সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর সে ঘরে বসে পড়ে,বাড়ির কাজ করে। স্কুলে যায়। পদ্মজার কথামতো প্রতিদিনের রুটিন অনুসরণ করে। সে বলল,'কী বলছে আপা? চিঠি দাও।'

পূর্ণা কপাল কুঁচকে বলল,'তোর পড়তে হবে না। বলছে,মাঘ মাসের ১৯ তারিখ আসছে। অনেকদিন থেকে যাবে।''

'আজ কত তারিখ?' প্রশ্ন করলেন বাসন্তী।

পূর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'১৯ শে মাঘ।'

বাসন্তীর চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বিস্ফোরিত কণ্ঠে বললেন,'আজই! বিকেল তো হয়ে গেছে।'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পূর্না অস্থির হয়ে বাসন্তীর কাছে দৌড়ে আসে। দুই হাতে ধরে করুণ স্বরে বলল,'তাড়াতাড়ি সালোয়ার কামিজ বের করো আমার। এই রূপে দেখলে একদম মেরে ফেলবে আপা।'

বাসন্তী আরোও করুণ স্বরে বললেন,'মা, আমি আগে আমার রূপ পাল্টাই। তুমি তোমারটা খুঁজে নাও।'

কথা শেষ করেই বাসন্তী ঘরের দিকে যান। বুক দুরুদুরু কাঁপছে। পরনে ঝিলমিল, ঝিলমিল করছে টিয়া রঙের শাড়ি। দুই হাতে তিন ডজন চুড়ি। কপালে টিপ,ঠোঁটে লিপস্টিক। এ অবস্থায় পদ্মজা দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তিনি সাজগোজ পূর্ণার কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর পূর্ণার কথায়ই দুজন মিলে আবার শুরু করেছেন। পদ্মজা এক-দুই দিনের জন্য প্রতি শীতে বাড়ি আসে তখন সব রঙ-বেরঙের জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়। পূর্ণা চিঠি প্রেমার হাতে দিয়ে ঘরে যায়। ট্রাঙ্ক খুলে সাদা-কালো রঙের সালোয়ারকামিজ দ্রুত পরে নেয়। হাতের চুড়ি খুলতে গিয়ে কয়টা ভেঙে যায়। অন্যবার দুই-তিন দিন আগে চিঠি আসে। আর আজ যেদিন পদ্মজা আসছে সেদিনই চিঠি আসতে হলো! দশ দিন আগে চিঠি পাঠিয়েছে পদ্মজা। ডাকঘর থেকেই দেরি করেছে। পূর্ণা মনে মনে ডাকঘরের কর্মচারীদের গালি দিয়ে চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। সে দ্রুত জুতা পরে বারান্দায় আসে। প্রেমাকে তাড়া দিল,'জলদি পানি নিয়ে আয়।'

প্রেমার বেশ লাগছে। সে মনেপ্রাণে দোয়া করছে,পদ্মজা এখুনি এসে যাক আর দেখুক পূর্ণার সাজগোজ। কিন্তু প্রকাশ্যে পূর্ণার আদেশ রক্ষার্থে কলসি নিয়ে কলপাড়ে গেল। পূর্ণা মনে মনে আয়তুল কুরসি পড়ছে! এই বুঝি পদ্মজা এসে গেলো! গতবার মার তো খেয়েছেই। তার সাথে পদ্মজা রাগ করে তিন মাস চিঠি লিখেনি। বাতাসের বেগে পাতায় মড়মড় আওয়াজ হচ্ছে। আর পূর্ণার মনে হচ্ছে, এইতো তার রাগী আপা হেঁটে আসছে। নাহ পানির জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। পূর্ণা কলপাড়ে ছুটে যায়। কলসি থেকে পানি নিয়ে পায়ের কাদা,ঠোঁটের লিপস্টিক ধুয়ে ফেলে। কপালের টিপ খুলে কলপাড়ের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে। হাতের চুড়ি, গলার হার,কানের বড় বড় দুল ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে এসেছে। পায়ের দিকে আবার চোখ পড়তেই, সে আঁতকে উঠল। নূপুরজোড়া হাঁটার সময় অনেক আওয়াজ তুলে। এ রকম নূপুর পরা নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ। আবার দৌড়ে গেল ঘরে। দৌড়ার সময় বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। নূপুর দুটো খুলে ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে দিয়ে মাটিতে ধপ করে বসে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। বিড়বিড় করে বলল,'বাঁচা গেল!'

এরপর হাঁটুতে থুতুনি রেখে মিষ্টি করে হাসল। আজ তার আপা আসবে। তার জীবনের সবচেয়ে দামী এবং ভালোবাসার মানুষটা আসবে। ঈদের আনন্দের চেয়েও বেশি এই আনন্দ। পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে যায়। প্রায় বছর খানেক পর আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে সে। বাসন্তী সাদা রঙের শাড়ি পরেছেন। তাড়াহুড়ো করে এটা ওটা রাঁধছেন। পূর্ণা সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াল। বাসন্তী বললেন,'প্রান্তরে বল গিয়ে লাল রঙের দাগ দেয়া রাজহাঁসটা ধরতে।'

পূর্ণা চুলায় লাকড়ি আরেকটা দিয়ে লাহাড়ি ঘরের দিকে যায়। প্রান্তকে লাহাড়ি ঘরেই বেশি পাওয়া যায়। প্রেমা পদ্মজার জন্য হেমলতার ঘরটা গুছাচ্ছে।

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ

[

আমি পদ্মজা - ৪৭

____

ইট-পাথরের শহরের সবই কৃত্রিম। কৃত্রিমতা ছেড়ে ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা গ্রাম, আঁকা-বাঁকা বয়ে চলা নদী-খাল, সবুজ শ্যামল মাঠের প্রাকৃতিক রূপ দেখে তৃষ্ণার্ত নয়নের পিপাসা মিটাতে গিয়ে পদ্মজা আবিষ্কার করল,তার চোখে খুশির জল! সবেমাত্র অলন্দপুরের গঞ্জের সামনে ট্রলার পৌঁছেছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। আলমগীর ও মগা উপস্থিত রয়েছে। তারা দুজন ট্রলার নিয়ে রেলষ্টেশনের ঘাটে অপেক্ষা করছিল। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল,'ইচ্ছে হচ্ছে জলে ঝাঁপ দেই।'

আমির আঁতকে উঠল,'কেন?'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এরপর বলল,'অল্পতে ভয় পেয়ে যান কেন? বলতে চেয়েছি,অনেকদিন পর চেনা নদীর জল দেখে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডুব দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। '

আমির এক হাতে পদ্মজার বাহু চেপে ধরে নিজের সাথে মিশিয়ে বলল,' তাই বলো!'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের গাল ভর্তি দাঁড়ি। ঘন হয়েছে খুব। চোখের দৃষ্টি গাঢ়,তীক্ষ্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ! অথচ,একটা সন্তান নেই। বাবা ডাক শুনতে পারে না। মানুষটার জন্য দুঃখ হয়। পদ্মজা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আযান পড়ছে। ট্রলার মোড়ল বাড়ির ঘাটে ভীড়ে। প্রথমে পদ্মজার চোখে পড়ে রাজহাঁসের ছুটে চলা। ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চারিদিক মুখরিত। ট্রলারের শব্দ শুনে পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত,ছুটে আসে ঘাটে। আগে আগে আসে পূর্ণা। পদ্মজা প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই পূর্ণা জান ছেড়ে ডেকে উঠল,'আপা।'

পূর্ণাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। সাবধান করে,'আস্তে পূর্ণা।'

বলতে বলতে সিঁড়িতে পূর্ণার পা পিছলে গেল। পদ্মজা দ্রুত আঁকড়ে ধরে। এখুনি অঘটন ঘটে যেত! পদ্মজা পূর্ণাকে ধমক দিতে প্রস্তুত হয়, তখনই পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পদ্মজাকে। বুকে মাথা রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করল,'আপা! আমার আপা!'

পদ্মজার বুক বিশুদ্ধ ভালোলাগায় ছেয়ে গেল। মৃদু হেসে পূর্ণাকে কিছু বলার জন্য আবার প্রস্তুত হয়,তখন প্রেমা,প্রান্ত এসে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা টাল সামলাতে না পেরে শেষ সিঁড়ি থেকে নদীর জলে পড়ে যাচ্ছিল,ট্রলারের আগায় দাঁড়িয়ে থাকা আমির দুই হাতে দ্রুত পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে তার খুঁটি হলো। পদ্মজা চোখ খিঁচে ফেলে। যখন বুঝতে পারল সে পড়েনি,তার ভাইবোনেরাও পড়ে যায়নি তখন চোখ খুলল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার সহধর্মীর মুখ দেখে হাসল। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পূর্ণা, প্রেমা হেঁচকি তুলে কাঁদছে! খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদে? তবে পদ্মজার ভালো লাগছে। বাসন্তীকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পদ্মজা তার ভাই-বোনদের বলল,'আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি না তোরা?'

পূর্ণা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,'চলো।'

পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে বাসন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা রঙের শাড়ি পরে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকা এই মানুষটার প্রতি পদ্মজার অনেক ঋণ। হেমলতা মারা যাওয়ার ছয় মাসের মাথায় মোর্শেদ পৃথিবী ছাড়েন।

শোকে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফেলে যান কিশোরী দুই মেয়ে,বউ এবং এক ছেলেকে। অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। সংসার চলে না। আমির সাহায্য করতে চেয়েছিল। পদ্মজার আত্মসম্মানে লাগে। সে কিছুতেই স্বামীর টাকায় বাবার বাড়ির সংসার চালাবে না। নিজেরও কাজ করার উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় বাসন্তী চাইলে ফেলে চলে যেতে পারতেন। তিনি যাননি। এক পড়ন্ত বিকেলে পদ্মজাকে বললেন,'নকশিকাঁথা সেলাই করতে পারি আমি। শখে সেলাই করতাম। দুই তিনজন পয়সা দিয়ে কিনতে চাইত। টাকার দরকার ছিল না,তাই বিক্রি করিনি। তুমি বললে,আমি নকশিকাঁথা গঞ্জে বেঁচার চেষ্টা করতাম।'

পদ্মজা সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। বাসন্তী ছুটে ঘরে যান। একটা নকশিকাঁথা নিয়ে আসেন। পদ্মজাকে দেখান। অসম্ভব সুন্দর হাতের কাজ! আমির নকশিকাঁথা দেখে মুগ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বলল,বড় ভাইয়া যখনি ঢাকা যাবে নকশিকাঁথা দিয়ে দিবেন। শহরে নকশিকাঁথার চাহিদা রয়েছে অনেক। আপনাদের সমস্যা কিছুটা হলেও ঘুচে যাবে। এক কাজ করলেই তো পারেন আরো দুই-তিনজনকে নিয়ে নকশিকাঁথা বানানো শুরু করেন। তাহলে অনেকগুলি হবে। তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিবেন। ঢাকা বিক্রির পর দ্বিগুণ টাকা আসবে।'

এ প্রস্তাবে পদ্মজা অমত করল না। সেদিন থেকে বাসন্তী দুই হাতে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। পূর্ণাকে মেট্রিক অবধি পড়ালেন। প্রেমা,প্রান্তকে এখনও পড়াচ্ছেন। পূর্ণার যেকোনো আবদার পূরণ করে চলেছেন। বাসন্তীর পা ছুঁয়ে পদ্মজা সালাম করল। এরপর বলল,'কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো আছি মা। তুমি, জামাইবাবা সবাই ভালো আছোতো?'

'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আগের চেয়ে শুকিয়েছেন। ত্বক ময়লা হয়েছে। নিজের যত্ন নেওয়া ভুলে গিয়েছেন?'

বাসন্তী চোখ নামিয়ে হাসেন। এক হাতে নিজের মুখশ্রী ছুঁয়ে বলল,'সেই বয়স কী আর আছে? বিধবা মানুষ!'

'পূর্ণা খুব জ্বালায় তাই না? বাধ্য করে রঙিন শাড়ি পরতে,সাজতে।'

বাসন্তী চমকে তাকালেন। পদ্মজা হাসছে। পূর্ণা মাথায় ব্যাগ নিয়ে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। আহ্লাদী হয়ে অভিযোগ করল,'আপা তুমি নাকি মুচির সাথে আমার বিয়ে দিতে এসেছো?'

পদ্মজা হাসি প্রশস্ত হয়। আমিরের দিকে তাকিয়ে এরপর পূর্ণার দিকে তাকাল। বলল,'কে বলেছে? তোর ভাইয়া?'

পূর্ণা আমিরকে ভেংচি কেটে পদ্মজাকে বলল,'আর কে বলবে? আপা আমি মুচি বিয়ে করব না। আমার ফর্সা, চকচকে জামাই চাই।'

মগা পূর্ণাকে রাগানোর জন্য বলল,'মেট্রিক ফেইল করা ছেড়িরে ধলা জামাই হাঙ্গা করব না।'

পূর্ণা কিড়মিড় করে তাকাল। পদ্মজা পূর্ণার গাল টেনে দিয়ে বলল,'আচ্ছা,এসব নিয়ে পরে আলোচনা হবে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। বাড়িতে চল।'

তারপর দুই হাতে দুই বোন-ভাইকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির উঠানে পা রাখে সে। সতেজ হয়ে জামাকাপড় পাল্টে নেয় আমির ও পদ্মজা। এরপর রাজহাঁস ভূনা আর গরম গরম ভাতের ভোজন হয়। আলমগীর, মগাও ছিল। আলমগীর বাড়ি ফেরার আগে আমির-পদ্মজাকে বলে যায়,'আগের স্মৃতি আর কতদিন বুকে রাখবি তোরা? দাদু মরার পথে। চাচি আম্মা আত্মগ্লানি আর তোদের না দেখার শোকে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে।

এবার অন্তত বাড়িতে আসিস। অনুরোধ রইল আমার। পদ্মজা তুমি আমিরকে বুঝিয়ো।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'এবার বাড়ির সবাইকে গিয়ে দেখে আসব। আপনি নিশ্চিন্তে যান।'

'অপেক্ষায় থাকব।''

'আসব ভাইয়া।' বলল পদ্মজা।

আলমগীর, মগা চলে গেল। আমির পদ্মজাকে বলল,'আমি যাব না।'

'এবার যাওয়া উচিত। অনেক তো হলো। চার বছর কেটেছে। ভয়ংকর রাতটা আজীবন বুকে তাজা হয়ে থাকবে। তাই বলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। ইসলামে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।'

'ওই বাড়িতে গেলে আমার দমবন্ধকর কষ্ট হয় পদ্মজা।'

'সে তো আমারও হয়। কিন্তু আম্মার কথা খুব মনে পড়ে। আম্মারতো কোনো দোষ ছিল না। তবুও শাস্তি পাচ্ছেন।'

'ছিল দোষ।'

'যে আসল দোষী তার দেখা আজও পেলাম না। অথচ,যিনি দোষী না তিনি সবার চোখে দোষী।'

'আম্মা সেদিন কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? এটাই আম্মার দোষ।'

'জোর করে ঘুম আটকিয়ে রাখা যায়? আমরা আগামীকাল যাচ্ছি,এটাই শেষ কথা।'

'পদ্মজ....'

আমিরের বাকি কথা পদ্মজা শুনল না। সে হেমলতার ঘরের দিকে এগুলো। হেমলতার ঘরের দরজা খুলতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শিহরিত হয়ে কেঁপে উঠে সে। ছয় বছর আগের মতোই সব। নেই শুধু মা! পদ্মজা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে। আলমারি খুলে হেমলতার শাড়ি বের করে ঘ্রাণ শুঁকে। বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হাউমাউ করে কান্নাটা আসে না অনেকদিন। কষ্টগুলো চেপে থাকে বুকের ভেতর। পূর্ণা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আপাকে দেখছে। পদ্মজা বার বার নাক টানছে। অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে মায়ের শাড়ি। যেন সে শাড়ি না তার মাকেই চুমু দিচ্ছে। পূর্ণার মন ব্যথায় ভরে উঠে। তার কী মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে নাকি আপার কান্না দেখে কষ্ট হচ্ছে? জানে না পূর্ণা। শুধু উপলব্ধি করছে,তার কান্না পাচ্ছে।

কান্নার শব্দ শুনে পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পূর্ণাকে কাঁদতে দেখে,দ্রুত চোখের জল মুছে হাতের শাড়ি আলমারিতে রাখল। এরপর পূর্ণাকে ডাকল,'আয় এদিকে।'

পূর্ণা ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগিয়ে আসে। পদ্মজা বিছানায় বসল। পূর্ণা পদ্মজার কোলে মাথা রেখে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ল। পদ্মজা বলল,'বয়স একুশের ঘরে। মনটা তো সেই চৌদ্দ-পনেরো বছরেই পড়ে আছে।'

পূর্ণা পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আমার খুব কান্না পাচ্ছে।'

'কাঁদিস না।'

'ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসছে তো।'

'থামানোর চেষ্টা কর।'

'থামছে না।'

'তুই তো আরো কাঁদছিস।'

'বেড়ে যাচ্ছে তো।'

Kobitor.com

পদ্মজা ঠাস করে পূর্ণার গালে থাপ্পড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। চোখ বড় বড় করে তাকায়। পদ্মজা আওয়াজ তুলে হেসে উঠে। পূর্ণা দ্রুত উঠে বসে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে বলল,'থেমে গেছে।'

পদ্মজার হাসি বেড়ে গেল। মুখে হাত চেপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করে।

হাসির ঠ্যালায় চোখে জল চলে আসে। পূর্ণা কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। থামাতে বললে,আরো বেড়ে যায়। ব্যাপারটা যে কেউ উপভোগ করে। প্রেমা ঘরে ঢুকে অভিমানী কণ্ঠে বলল,'আমাকে ছাড়া কী নিয়ে কথা বলে হাসা হচ্ছে?'

পদ্মজা হাসতে হাসতে বলল,'পূর্ণা কাঁদছিল। থামাতে পারছিল না।'

প্রেমা হেসে বিছানায় উঠে বসে। দুই পা ভাঁজ করে বসে বলল,' বড় আপা,ছোট আপা নামায পড়ে না।'

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল,'কী রে? তুই নামায পড়িস না কেন? চিঠিতে তো বলিস অন্য কথা।'

পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে প্রেমাকে লবণ,মরিচ দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে কাঁচা আমের মতো কামড়ে খেতে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সামলাতে হবে। সে পদ্মজাকে বোঝানোর চেষ্টা করল,'আপা,বিশ্বাস করো শুধু এক ওয়াক্ত পড়িনি। আর...আর প্রেমাকে আমি আমার...হ্যাঁ আমার চুড়ি দেইনি বলে...'

'মিথ্যে বলবি না। কতবার বলেছি,মিথ্যা কথা ছাড়তে। সত্য স্বীকার কর। কীসের কাজ তোর? পড়ালেখা ছেড়েছিস,চার বছর। মেট্রিকটা আবার পড়লি না। বিয়ে করতে চাস না বলে বিয়ের জন্যও জোর করিনি। তার মূল্য এভাবে কথা না শুনে দিবি? এটা তো আমারও কথা না। যিনি সৃষ্টি করেছেন উনার আদেশ।'

পূর্ণা মাথা নত করে রাখে। পদ্মজা বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল,'ঘুমাব না তোদের সাথে।'

প্রেমা আর্তনাদ করে উঠল,'আপা,আমার দোষ কী?'

পূর্ণা পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে। কিছুতেই যেতে দিবে না। পদ্মজা বলল,'ছাড় বলছি।'

পূর্ণা আকুতি করে বলল,'যেও না। এখন থেকে প্রতিদিন পড়ব। সত্যি বলছি।'

'সত্যি তো?' বলল পদ্মজা।

'সত্যি।'

পদ্মজা বিছানায় পা তুলে বসল। পূর্ণা আড়চোখে প্রেমাকে দেখল। দৃষ্টি দিয়ে যেন হুমকি দিল,'আমারও দিন আসবে!'

গ্রামে আসলে আমির প্রান্তর সাথে ঘুমায়। পদ্মজাকে তার বোনদের সাথে ছেড়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই বোনকে নিয়ে শুয়ে পড়ে পদ্মজা। কত কত গল্প তাদের! পদ্মজা শুধু শুনছে আর হাসছে। প্রেমার মুখ দিয়ে সহজে কথা আসে না,পদ্মজা আসলে কথার ঝুড়ি নিয়ে বসে। পূর্ণা নিজের বিয়ে নিয়ে বেশি কথা বলছে। পরিকল্পনা করছে। তখন প্রেমা ব্যাঙ্গ করে বলল,'ছোট আপার লজ্জার লেশমাত্র নেই।'

তখন পূর্ণা ক্ষেপে গিয়ে বলল,'তুই যে প্রান্তরে বলছিলি শহরে গিয়ে সাহসী পুলিশ বিয়ে করবি। আমি কাউকে বলেছি? বলেছি,তোর লজ্জা নাই?

প্রেমা লজ্জায় জবুথবু হয়ে যায়! তার বড় আপার সামনে ছোট আপা কী বলছে! লজ্জায় কান দিয়ে ধোয়া বেরোতে থাকে। পদ্মজা হাসল। প্রেমাকে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। অভিভাবকদের নিজের পছন্দ জানানো উচিত। তোর বিয়ে পুলিশের সাথেই হবে। আর পূর্ণার বিয়ে হবে পূর্ণার পছন্দমত।'

পদ্মজার কথায় পূর্ণা ভারি খুশি হলো। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল,' নায়কের মতো জামাই চাই। একদম লিখন ভাইয়ার মতো। ওহ আপা, জানো লিখন ভাইয়া এখানে শুটিং করতে আসছে। এক সপ্তাহ হলো।'

পদ্মজা জানতে চাইল,'কার বাড়ি?'

'সাতগাঁয়ের হান্নান চাচার বাড়ি। বিশাল বড় টিনের বাড়ি।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এই মানুষটা শুধুমাত্র তার স্মৃতি। কিন্তু মানুষটার জীবনের পুরোটা জুড়ে সে। এইতো মাস চারেক আগে, পদ্মজা পত্রিকা পড়তে বসেছিল। তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখন শাহর ছবি সাথে উপরের শিরোনাম দেখে বেশ অবাক হয় পদ্মজা। শিরোনামে লেখা, 'লিখন শাহর পদ্ম ফুল'। পদ্মজা আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়ে। সাংবাদিক লিখনকে প্রশ্ন করেছেন, 'ত্রিশ তো পার হয়েছে। বিয়ে করবেন কবে?'

লিখন জানিয়েছে,'সে যখন আসবে।'

'আমরা কী জানতে পারি,কে সে? যদি দ্বিধা না থাকে।'

'জানাতে আমার বাধা নেই। সে পদ্ম ফুল। আমার সাতাশ বছরের কঠিন মনে তোলপাড় তুলে দিয়েছিল। সেই তোলপাড়ের তাণ্ডব বুকের ভেতর আজও হয়। সেই ফুলের সুবাস নাকে আজও লেগে আছে। শুধু আমি তাকে জয় করতে পারিনি।'

লিখন শাহর সাক্ষাৎকারের কথোপকথন বেশ তোলপাড় তুলে ঢাকায়। এরকম একজন সুদর্শন পুরুষকে কোন নারী অবহেলা করেছে? তা নিয়ে মানুষের কত কল্পনা-জল্পনা, আলোচনা -সমালোচনা। পদ্মজার অস্বস্তি হয় খুব।

পূর্ণা পদ্মজাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল,'ঘুমিয়ে গেলে আপা?'

'না। তারপর বল।' নিস্তরঙ্গ গলায় বলল পদ্মজা।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শিয়ালের হাঁক ভেসে আসছে কানে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। তবুও কথা শেষ হচ্ছে না পূর্ণা-প্রেমার। পদ্মজাও মানা করছে না। বরং অবাক হচ্ছে,তার বোনেরা কত কথা লুকিয়ে রেখেছে তার জন্য!

কাক ডাকা ভোর। ঘন কুয়াশায় চারপাশ ডুবে আছে। বাতাসের বেগ বেশি। ঠান্ডায় ঠোঁট কাঁপছে। পদ্মজার পরনে দামী,গরম সোয়েটার। আবার শালও পরেছে। বাসন্তী সুতি সাদা শাড়ি পরে রান্না করছেন। মাঝে মাঝে কাঁপছেন। পদ্মজা দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে ঢুকল। বাসন্তী পদ্মজাকে দেখে হেসে বললেন,'কিছু লাগবে?'

পদ্মজা খেয়াল করে দেখল বাসন্তীর মুখটা ফ্যাকাসে। ঠান্ডায় এমন হয়েছে। সে শক্ত করে প্রশ্ন করল,'আপনার শীতের কাপড় নেই?'

বাসন্তী হেসে বলল,'আছে তো।'

'তাহলে এভাবে শীতে কাঁপছেন কেন? নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। বয়স হয়েছে তো। যান ঘরে যান।'

'ভাত বসিয়েছি।'

'আমি দেখব।'

'সারারাত তো সজাগ ছিলে আম্মা। তুমি ঘুমাও। আমি রাতে ঘুমিয়েছি।'

'তাহলে সোয়েটার পরে আসেন।'

বাসন্তী মাথা নত করে বসে রইলেন। পদ্মজা বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর নিজের গায়ের শাল বাসন্তীর গায়ে দিয়ে বলল,'নিজের জন্যও কিছু কেনা উচিত। পূর্ণা বয়সে বেড়েছে বুদ্ধিতে না। ও পারে না কিছু সামলাতে। শুধু আবদার করতে পারে। যতদিন বেঁচে আছেন নিজের যত্ন নিন। আমি ঘরে যাচ্ছি।'

পদ্মজা রান্নাঘর ছেড়ে বারান্দার গ্রিলে ধরে বাইরে তাকাল। কুয়াশার জন্য বাড়ির গেইটও দেখা যাচ্ছে না। সে ঘুরে দাঁড়াল ঘরে ঢোকার জন্য। তখন মনে হলো, উঠানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আবার ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল,তার শ্বাশুড়ি ফরিনাকে। তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে আছে। শুকিয়েছে খুব বেশি। গায়ে লাল-সাদা রঙের মিশ্রণে শাড়ি। ফরিনার চারপাশে উড়ো কুয়াশা। কুয়াশার দেয়াল ভেদ করে যেন

তিনিই শুধু আসতে পেরেছেন। পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে বের হলো। কাছে এসে দাঁড়াতেই বুকটা হুহু করে উঠল। ফরিনা পদ্মজাকে দেখে কেঁদে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর ফরিনার ঠান্ডা দুই হাত ধরে বলল,'এতো সকালে কেন আসতে গেলেন? আমরা তো যেতামই।'

'এতো রাগ তোমার?'

'না,আম্মা। আপনার প্রতি কোনো রাগ নেই আমার। আট মাস আপনি আমার যে যত্ন নিয়েছেন মায়ের অভাববোধ করিনি। মনে হয়েছিল, আমার মা ছিল আমার পাশে।'

'তাইলে কেরে যাও না আমার কাছে? আমার ছেড়ায় কেন মুখ ফিরায়া নিছে আমার থাইকা?'

'উনি পাগল। আম্মা, আপনি কেমন আছেন? দেখে বোঝা যাচ্ছে,ভালো নেই। আম্মা বিশ্বাস করুন,আপনার প্রতি আমাদের রাগ নেই। ওই বাড়িটা দেখলে খুব কষ্ট হয় আম্মা। খুব যন্ত্রনা হয়। এজন্য যাই না। আপনাকে অনেকবার চিঠি লিখেছি, যেন ঢাকা গিয়ে কয়দিন থেকে আসেন। গেলেন না কেন?'

ফরিনা অবাক হয়ে বললেন,'আমার কাছে তো কুনু চিডি আসে নাই।'

'সেকী! আমি তো এই চার বছরে ছয়টা চিঠি লিখেছি আপনার নামে। পাঠিয়েছিও।'

'আমি তো পাই নাই।'

ফরিনা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পদ্মজা বলল, 'আচ্ছা এ ব্যাপারে কথা বলব উনার সাথে। আমি যখন আম্মার কবর জিয়ারত করতে আসি তখনও তো এসে আমাকে আর উনাকে দেখে যেতে পারতেন আম্মা।'

'তোমরা বাড়িত যাও না বইলা,আমি ভাবছি আমারে ঘেন্না করো তোমরা তাই সামনে আইতে পারি নাই। আমার জন্যও আমার নাতনিডা...'

ফরিনা হুহু করে কেঁদে উঠলেন। পদ্মজার চোখ ছলছল করে উঠল। সে ফরিনাকে বলল,'আপনার জন্য কিছু হয়নি আম্মা। আপনি এভাবে ভাববেন না। কান্না থামান।'

'যতই বলো মা,কান্না থামাবে না। চার বছর ধরে এভাবে কাঁদছে।'

মজিদের কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা দ্রুত ঘোমটা টেনে নিল। মজিদকে সালাম করে বলল,'ভালো আছেন আব্বা?'

'এইতো আছি কোনোমতে।'

'আম্মা,আপনি কান্না থামান। আমার খারাপ লাগছে।'

ফরিনা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। এরপর বললেন,'আমার বাবু কই?'

'ভেতরের ঘরে ঘুমাচ্ছে। ডেকে দিচ্ছি।'

'না,থাহক। ঘুমাক।'

পদ্মজা শ্বশুর, শ্বাশুড়িকে সদর ঘরে নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে সবার ঘুম ভাঙে। আমির যত যাই বলুক, মাকে দেখেই নরম হয়ে যায়। জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ ছেলে আর ছেলের বউকে ছাড়া কিছুতেই বাড়ি যাবেন না। কম হলেও চার-পাঁচ দিন থেকে আসতে হবে। অবশেষে, আমির রাজি হলো। প্রেমার সামনে পরীক্ষা তাই প্রেমাকে সাথে নিল না। বাসন্তী, প্রেমা,প্রান্ত বাড়িতে রয়ে যায়। পূর্ণা সাথে যায়।

হাওলাদার বাড়ির গেইট পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই পদ্মজার সর্বাঙ্গ অদ্‌ভুত ভাবে কেঁপে উঠে। সূর্য উঠেনি। দমকা বাতাস হচ্ছে। সেই বাতাসে সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে বাজপাখি উড়ে যায়। সেই পাখির ডাক অদ্‌ভুত হাহাকারের মতো। যেনও মনের চেপে রাখা কষ্ট ও ক্ষোভ নিয়ে কেউ আত্মচিৎকার করছে। নাকি এটা নিছকই পদ্মজার ভাবনা? চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চার বছর পূর্বেই তো এখানে এই জায়গাটায় তার আদরের তিন মাসের কন্যা পারিজার রক্তাক্ত লাশ পড়ে ছিল! পদ্মজার বুক কেমন করে উঠল! বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমির উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল,'খারাপ লাগছে?'

পদ্মজা স্বাভাবিক হয়ে বলল,'না।'

থামল, নিঃশ্বাস নিল। এরপর বলল,' পূর্ণাকে দেখুন,কেমন পাগল।'

আমির সামনে তাকাল। পূর্ণা মাথার উপর ব্যাগ নিয়ে সবার আগে বড়ই খেয়ে খেয়ে কোমর দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! অন্দরমহলের সামনে এবং আলগ ঘরের পিছনের মধ্যিখানে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। হেমন্তকালে ধান কাটা হয়েছে,তখন কামলারা আলগ ঘরে থেকেছে। তাদের জন্যই এই টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। টিউবওয়েলের চারপাশে গোল করে সিমেন্ট দিয়ে মেঝেও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা কলপাড় তৈরি হয়েছে। পূর্ণা নারিকেল গাছের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। কলপাড়ে এক সুদর্শন যুবক পিঁড়িতে বসে গোসল করছে। পরনে লুঙ্গি। রানি গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন বলছে। পূর্ণা ব্যাগ রেখে হা করে সেই যুবককে পরখ করে। সুঠম,সুগঠিত শরীর,মায়াবী- ফর্সা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক। প্রশস্ত বুকে ঘন পশম। চওড়া পিঠ। শক্তপোক্ত দেখতে দুই হাত। ডান হাতে ছোট কলস নিয়ে মাথায় পানি ঢালছে। সেই জল চুল থেকে কপাল,কপাল থেক ঠোঁট,ঠোঁট থেকে বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ চুল ঝাঁকি দিয়ে উঠল। জলের ছিটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। রানি যুবকটিকে বকতে বকতে দূরে সরে দাঁড়ায়। যুবকটি আবারও মাথায় পানি ঢেলে চুল ঝাঁকায়। উদ্দেশ্য, রানিকে ভিজিয়ে দেয়া। পূর্ণা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দ্রুত ব্যাগ মাটিতে রেখে দিল। ওড়না ঠিক করে,চুল ছেড়ে দিল। এরপর কলপাড়ের দিকে হেঁটে গেল। ঠোঁটে তার হাসি।

চোখের দৃষ্টি দেখলে যে কারো মনে হবে, পূর্ণা অপরিচিত এই যুবকটিকে চোখ দিয়ে পিষে ফেলছে। কলপাড়ের পাশে ভেজা কাদা ছিল। পূর্ণা পা রাখতেই পিছলে পড়ে যায়। ধপাস শব্দ শুনে যুবকটি লাফিয়ে উঠে ভরাট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'বোয়াল মাছ! বোয়াল মাছ!'

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

[আমি পদ্মজা - ৪৮

____

ঘটনাটি পদ্মজার চোখে পড়তেই ছুটে আসে। রানি আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব। সে পূর্ণাকে তুলতে দৌড়ে আসতে গিয়ে শাড়ির সাথে পা প্যাঁচ লাগিয়ে পূর্ণার চেয়ে ঠিক এক হাত দূরে ধপাস করে পড়ল! এ যেন ধপাস করে পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুবকটি হাসবে নাকি সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সেকেন্ড দুয়েক ভেবে মনস্থির করল, হাসা ঠিক হবে না। সাহায্য করা উচিত। কলপাড় থেকে এক পা নামাতেই পদ্মজা চলে আসে। পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। যুবকটি রানিকে সাহায্য করে উঠার জন্য। পদ্মজা উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল,'খুব ব্যথা পেয়েছিস?'

পূর্ণার মুখ ঢেকে আছে রেশমি ঘন চুলে। আড়চোখে একবার যুবকটিকে দেখল। এরপর মিনমিনিয়ে বলল,'না।'

ফরিনা ছুটে এসে বললেন,'এইডা কেমনে হইলো। এই ছেড়ি এমনে আইলো কেন? ও ছেড়ি কোনহানে দুঃখ পাইছো?'

পূর্ণা নরম কন্ঠে বলল,'চাচি,ব্যাথা পাইনি।'

'পাওনি মানে কী? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছো না। পদ্মজা,ওকে নিয়ে যাও। কাদা মেখে কী অবস্থা!' বলল আমির।

রানি পদ্মজা আর আমিরকে দেখে প্রচন্ড অবাক হয়েছে! খুশিতে তার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল,'দাভাই? তুমি আইছো! পদ্মজা, এতোদিনে আমরারে মনে পড়ছে?'

পদ্মজা মৃদু হেসে বলল,'তোমাকে সবসময়ই মনে পড়ে আপা। আমরা পরে অনেক গল্প করব। পূর্ণাকে নিয়ে এখন ভেতরে যাই।'

পদ্মজা এবং ফরিনা পূর্ণাকে ধরে ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। পিছু পিছু রানিও গেল। যুবকটি আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল,'আসসালামু আলাইকুম আমির ভাই। চিনতে পারতাছেন?'

Kobitor.com

আমির যুবকটিকে চেনার চেষ্টা করল। এরপর বলল,'মৃদুল না?'

'জি ভাই।'

আমিরের হাসি প্রশস্ত হলো। মৃদুলের সাথে করমর্দন করে বলল,'সেই ছোটবেলায় দেখেছি। কতবড় হয়ে গেছিস। চেনাই যাচ্ছে না।'

'আমার ঠিকই আপনারে মনে আছে।'

আমির মৃদুলের বাহুতে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল,'ছোটবেলা তো তুমি করে বলতি। এখন আপনি আপনি বলছিস কেন?'

মৃদুল এক হাতে ঘাড় ম্যাসাজ করে হাসল। এরপর বলল,'১৬-১৭ বছর পর দেখা হইছে তো।'

'তো কী হয়েছে? তুমি বলে সম্বোধন করবি। গোসল করছিলি নাকি?'

'জি।'

'কাপড় পাল্টে আয়,অনেক আলাপ হবে।'

'আচ্ছা ভাই।'

আমির নারিকেল গাছের পাশে তাদের ব্যাগ দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা নিল,এরপর অন্দরমহলের দিকে গেল।

বৈঠকখানায় পদ্মজা বসে আছে। পূর্ণার কোমরে,পায়ে গরম সরিষা তেল মালিশ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছে। হুমকিও দিয়ে এসেছে,ঘর থেকে বের হলে একটা মারও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা মুখ দেখে মনে হয়েছে,আর বের হওয়ার সাহস করবে না। বেশ জোরেই পড়েছিল। পা,কোমর লাল হয়ে গেছে। এই বাড়িটা মৃতপ্রায়। আগে তাও মানুষ আছে বলে মনে হতো। এখন মনেই হয় না এই বাড়িতে কেউ থাকে। নির্জীব, স্তব্ধ। রান্নাঘর থেকে বেশ কিছুক্ষণ পর পর টুংটাং শব্দ আসছে। ফরিনা এবং আমিনা তাড়াহুড়ো করে রান্না করছেন। আমির বের হয়েছে। বাড়িতে মাত্রই এলো আর কীসের কাজে বেরিয়েও পড়ল। স্তব্ধতা ভেঙে একটা ছোট বাচ্চা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে। বাচ্চাটার কোমরে, গলায় তাবিজ। তাবিজের সাথে ঝনঝন শব্দ তোলা জাতীয় কিছু গলায় ঝুলানো। পদ্মজা বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। রানি বৈঠকখানায় এসে বাচ্চাটিকে বলল,'আলো আম্মা,এদিকে আয়। তোর গায়ে ময়লা। পদ্ম মামির কাপড়ে লাগব।'

পদ্মজা আলোর গাল টেনে বলল,'কিছু হবে না। থাকুক।'

এরপর আলোর গালে চুমু দিল। আলোর দুই বছর। রানির মেয়ে হয়েছে শুনেছিল পদ্মজা। কিন্তু আসতে পারেনি দেখতে। এবারই প্রথম দেখা। পদ্মজা বলল,'আলো ভাগ্যবতী হবে। দেখতে বাপের মতো হয়েছে।'

বাপের মতো হয়েছে কথাটি শুনে রানির মুখ কালো হয়ে যায়। তার প্রথম বাচ্চা মারা যাওয়ার এক বছরের মাথায় সমাজের নিন্দা থেকে বাঁচাতে খলিল হাওলাদার রানির জন্য পাত্র খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু কেউই রানিকে বিয়ে করতে চায় না। সবাই জেনে গিয়েছিল,রানি অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছে। এরপর বাচ্চাটা মারাও গেল। কোনো পরিবার রানিকে ঘরের বউ করতে চাইছিল না। এদিকে বিয়ে দিতে না পেরে সমাজের তোপে আরো বেশি করে পড়তে হচ্ছিল। খলিল হাওলাদার পিতা হয়ে রানিকে ফাঁস লাগিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তখন মজিদ হাওলাদার মদনকে ধরে আনলেন। মদন,মগার বাবা মা নেই। দুই ভাই এই বাড়িতেই ছোট থেকে আছে। এই বাড়ির সেবার কাজে নিযুক্ত। বাধ্য হয়ে মদনের সাথে বাড়ির মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। মদন কামলা থেকে ঘর জামাই হয়। রানি মন থেকে মদনকে আজও মানতে পারেনি। কখনোও পারবেও না। ঘৃণা হয় তার। মাঝে মাঝে আলোকেও তার সহ্য হয় না। আলোর মুখটা দেখলেই মনে হয়, এই মেয়ে মদনের মেয়ে। কামলার মেয়ে!

আলো আধোআধো স্বরে বলল,'নান্না,নান্না।'

পদ্মজা আদুরে কণ্ঠে বলল,'নানুর কাছে যাবে?'

আলো পদ্মজার কোল থেকে নামতে চাইল। পদ্মজা নামিয়ে দিল। আলো দৌড়ে রান্নাঘরে যায়। রানি বলল,'আম্মার জন্য পাগল এই ছেড়ি। সারাবেলা আম্মার লগে লেপ্টায়া থাকে।'

'তুমি নাকি আলোকে মারধোর করো?'

রানি চমকাল। প্রশ্ন করল,'কেলা কইছে?'

'শুনেছি। আলো একটা নিষ্পাপ পবিত্র ফুল। ওর কী দোষ?'

রানি চুপ করে রইল। পদ্মজা বলল,'সব রাগ এইটুকু বাচ্চার উপর ঝাড়া ঠিক না আপা।'

'আমার কষ্টডা বুঝবা না পদ্মজা।'

'বুঝি। এতোটা অবুঝ না আমি। আলো মদন ভাইয়ার মেয়ে এটা ঠিক। কিন্তু তোমারও তো মেয়ে। তোমার গর্ভে ছিল। তোমার রক্ত খেয়েছে দশ মাস।'

'আমি কী আমার ছেড়িরে ভালোবাসি না? বাসি। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। জানো পদ্মজা,আবদুল ভাইয়ের কথা মনে হইলে আমার সব অসহ্য লাগে। একলা একলা কাঁনদি। তহন আলো কানলে...আমি ওরে এক দুইডা থাপ্পড় মারি। পরে আফসোস হয় কেন মানলাম ছেড়িডারে। ও তো আমারই অংশ।'

'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো। নিয়তির উপর কারো হাত নেই। অতীত ভুলতে বলব না। কিছু অতীত ভুলা যায় না। কিন্তু চাইলেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে বাঁচা যায়। নিজেকে মানিয়ে নাও। আলোর প্রতি যত্নশীল হও। মানুষের মতো মানুষ করো। একটা মেয়েকে নিয়ে সমাজে বাঁচা যুদ্ধের মতো। গোড়া থেকে খেয়াল দাও।'

'তোমার কথা হুনলে বাঁচার শক্তি পাই পদ্মজা।'

Kobitor.com

পদ্মজা হাসল। বৈঠকখানায় আমির এসে প্রবেশ করল। তার পিছু পিছু মৃদুল। মৃদুলকে দেখে রানি হাসল। পদ্মজাকে দেখিয়ে বলল,'এইযে এইডা হইছে,পদ্মজা। তোর ভাবি।'

মৃদুল পদ্মজাকে সালাম করার জন্য ঝুঁকতেই পদ্মজা বলল,'না,না। কোনো দরকার নেই। বসুন আপনি।'

মৃদুল বসল। এরপর পদ্মজাকে বলল,'আপনের কথা কথা অনেক শুনছি। আজ দেখার সৌভাগ্য হলো।'

আমির পদ্মজাকে বলল,'ওর নাম মৃদুল। রানির মামাতো ভাই। ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে কয়দিন পর পর আসতো। যখন আট-নয় বছর তখন দূরে চলে যায়। আর দেখা হয়নি। চাইলেই দেখা হতো। কেউ চায়নি। তাই দেখাও হয়নি।'

'কোথায় থাকেন?' জানতে চাইল পদ্মজা।

'জি ভাবি,রামপুরা।'

রামপুরার কথা পদ্মজা শুনেছে। তাদের জেলার শহর এলাকার নাম রামপুরা। সবাই চিনে এই এলাকা। ছেলেটার চেহারা উজ্জ্বল, চকচকে। হাসিখুশি! আলাপে আলাপে জানতে পারল,মৃদুল পদ্মজার চেয়ে দুই বছরের বড়। মেট্রিক ফেইল করার পর আর পড়েনি। মিয়া বংশের ছেলে। কথাবার্তায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ দুই রূপই আছে। আর ভীষণ রসিক মানুষও বটে!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা দোতলায় গেল। সাথে আমির রয়েছে। নূরজাহান বেশ কয়েক মাস ধরে অসুস্থ। শরীরের জায়গায় জায়গায় ঘা। চামড়া থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। সারাক্ষণ যন্ত্রনায় আর্তনাদ করেন। নূরজাহানের ঘরে ঢুকতেই নাকে দূর্গন্ধ লাগে। পদ্মজা নাকে রুমাল চেপে ধরে। নূরজাহান বিছানার উপর শুয়ে আছেন। সময়ের ব্যবধানে একেবারে নেতিয়ে গিয়েছেন। বয়সটা যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। হাড্ডি ভেসে আছে। লজ্জাস্থান ছাড়া পুরো শরীর উন্মুক্ত। এক পাশে লতিফা দাঁড়িয়ে আছে। নূরজাহানের মাথার কাছে একজন কবিরাজ বসে রয়েছেন। একটা কৌটা থেকে সবুজ দেখতে তরল কিছু নূরজাহানের ক্ষত স্থানগুলোতে লাগাচ্ছেন। পদ্মজা নূরজাহানের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নাক থেকে রুমাল সরিয়ে দূর্গন্ধের সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ডাকল,'দাদু? দাদু...শুনছেন।'

নুরজাহান ধীরে ধীরে চোখ খুলেন। পদ্মজা প্রশ্ন করল,'খুব কষ্ট হয়? কোথায় কোথায় বেশি যন্ত্রণা হয়?'

নূরজাহান শুধু তাকিয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজার বুকটা হাহাকার করে উঠল। বয়স্ক একজন বৃদ্ধা কত কষ্ট করছে! লতিফা বলল,'দাদু কথা কইতে পারে না। খালি কান্দে।'

নূরজাহানের অসহায় চাহনি দেখে পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। সে নূরজাহানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,'আল্লাহর নাম স্বরণ করেন। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য্য ধরুন।'

তারপর লতিফাকে বলল,'ভালো করে খেয়াল রেখো উনার।'

আমির বেশ অনেকক্ষণ নূরজাহানের সাথে কথা বলল। নূরজাহান জবাব দেন না,শুধু উ,আ শব্দ করেন। আমিরের দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে। পদ্মজার ভালো লাগে না দেখতে। সে আমিরকে বুঝিয়ে,শুনিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। বারান্দা পেরোনোর পথে রুম্পার ঘরের দরজা খোলা দেখল পদ্মজা। যাওয়ার সময় তো বন্ধই ছিল। পদ্মজা ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। দেখল,কেউ নেই। পালঙ্কও নেই। সে আমিরকে প্রশ্ন করল,'রুম্পা ভাবি কোথায়?'

আমিরও এসে উঁকি দিল। খালি ঘর। সে অবাক স্বরে বলল,'জানি না তো।'

পদ্মজা চিন্তায় পড়ে গেল। হেমলতা মারা যাওয়ার পর গ্রামে আর থাকেনি। শহরে ফিরে যায়। এক মাসের মাথায় জানতে পারল, সে গর্ভবতী। গর্ভাবস্থার প্রথম পাঁচ মাস খুব খারাপ যায়। প্রতি রাতে হেমলতাকে স্বপ্নে দেখতো। ছয় মাসের শুরুতে ফরিনা নিয়ে আসেন গ্রামে। এ সময় পদ্মজার একজন মানুষ দরকার। কাছের মানুষদের দরকার। তাই আমিরও নিষেধ করেনি। তার মধ্যে আবার মারা গেলেন মোর্শেদ। পদ্মজা আরো ভেঙে পড়ে। কাছের মানুষদের সহযোগিতায়, বাচ্চার কথা ভেবে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে। সফলও হয়। তখন পদ্মজা অনেকবার চেষ্টা করেছে রুম্পার সাথে দেখা করার। মদন আর,নূরজাহানের নজরের বাইরে গিয়ে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। এরপর কোল আলো করে এলো ফুটফুটে কন্যা। পদ্মজা তারপরও চেষ্টা চালিয়ে গেল। রুম্পাকে নজরবন্দি করে রাখাটা খটকা বাড়িয়ে দেয়।

একদিন সুযোগ আসে। সেদিন রাতে নূরজাহান, মদন, আমির,রিদওয়ান,আলমগীর সবাই যাত্রাপালা দেখতে যায়। বাড়িতে বাকিরা থাকে। দুই তলায় শুধু পদ্মজা তার মেয়ে পারিজা আর ফরিনা ছিল। ফরিনার দায়িত্বে পারিজাকে রেখে রুম্পার ঘরে যায় পদ্মজা। রুম্পা তখন প্রস্রাব,পায়খানার উপর অচেতন হয়ে পড়েছিল। পদ্মজা নাকে আঁচল চেপে ধরে সব পরিষ্কার করে। রুম্পার জ্ঞান ফেরায়। জানতে পারে তিন দিন ধরে রুম্পাকে খাবার দেয়া হচ্ছে না। পদ্মজা খাবার নিয়ে আসে। রুম্পাকে খাইয়ে দেয়। কথা বলার সুযোগ হওয়ার আগেই ফরিনার চিৎকার ভেসে আসে। ফরিনার কাছে পারিজা আছে! পদ্মজার বুক ধক করে উঠে। ছুটে বেরিয়ে আসে। ঘরে এসে দেখে ফরিনা নেই। ফরিনার আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা সেই আর্তনাদের সাথে দুমড়ে,মুচড়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে উল্টিয়ে পড়ে। তবুও ছুটে যায়। ফরিনার কান্নার চিৎকার অনুসরণ করে অন্দরমহলের বাইরে বেরিয়ে আসে। চাঁদের আলোয় ভেসে উঠে তার তিন মাসের কন্যার রক্তাক্ত দেহ। ফুটফুটে কন্যা! ছোট ছোট হাত,পাগুলো নিথর হয়ে পড়ে আছে। সময় থেমে যায়। মনে হয়, নিশুতি রাতের প্রেতাত্মারা একসঙ্গে, একই স্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়। কোন পাষাণ মানবসন্তান তিন মাসের বাচ্চার গলায় ছুরি চালিয়েছে? তার কী হৃদয় নেই? পদ্মজা মেয়ের নাম ধরে ডেকে চিৎকার দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

পুলিশ আসে,তদন্ত হয়। ফরিনা দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হাত বাড়িয়ে দেখেন,পারিজা নেই। দ্রুত উঠে বসেন। পদ্মজা নিয়ে গেল নাকি খুঁজতে থাকেন। বারান্দা থেকে বাইরে চোখ পড়তেই দেখলেন,একজন মোটা, কালো লম্বা চুলের লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। খালি জায়গায় কাঁথায় মোড়ানো কিছু একটা পড়ে আছে। ফরিনা ছুটে বাইরে আসেন। নাতনির রক্তাক্ত দেহ দেখে চিৎকার শুরু করেন। পুলিশ কোনো কিনারা খুঁজে পায়নি। এরপরের দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠে। পদ্মজা মাঝরাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। খাওয়া-দাওয়া একদমই করতো

না। মাঝরাতে মেয়ের কবরে ছুটে যেত। আমির পদ্মজাকে নিয়ে হাওলাদার বাড়ি থেকে দূরে সরে আসে। প্রায় এক বছর পদ্মজা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এরপর বুকে ব্যথা নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে,একদিন ফিরবে অলন্দপুর। সেই নিষ্ঠুর খুনিকে শাস্তি দিবেই। জানতে চাইবে,কীসের দোষে তার তিন মাসের কন্যা বলি হলো?

কেউ জানুক আর নাই বা জানুক,পদ্মজা জানে হাওলাদার বাড়িতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য,পারিজার খুনিকে বের করা। সে শতভাগ নিশ্চিত এই বাড়ির কেউ না কেউ জড়িত এই খুনের সাথে। শুধু বের করার পালা। পুরনো কথা মনে পড়ে পদ্মজা দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকল। আমির জল মুছে দিল। এরপর বলল,'বোধহয় তিন তলায় রাখা হয়েছে।'

পদ্মজা তিন তলার সিঁড়ির দিকে তাকাল। শুনেছে,তিন তলার কাজ নাকি সম্পূর্ণ হয়েছে। অনেকগুলো ঘর হয়েছে। সে আর কথা বাড়াল না।   এখন গোসল করা উচিত। আযান পড়বে। আজ রাত থেকেই সে নিশাচর হবে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে,সব রহস্যের জাল কাটতে হবে। এটাই তার নিজের সাথে নিজের প্রতিজ্ঞা। আমির ডাকল,'কী হলো? কী ভাবো?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল,'কিছু না। ঘরে চলুন।'

'কিছু তো ভাবছিলে।'

'এতদিনের জন্য আসছি গ্রামে। চাকরিটা থাকবে তো?'

'থাকবে না কেন? রফিক কতোটা সম্মান করে আমাকে দেখোনি? আর তোমার যোগ্যতার কী কমতি আছে? যেখানে ইচ্ছে সেখানেই চাকরি হবে।'

পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,'আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে চাকরি করতে দিবেন?'

আমির হেসে ফেলল। বলল,'তা অবশ্য দেব না।'

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

মাথা নত করে সালাম করা ঠিক না। কথাটি অনেকেই আমাকে বলেছেন। আমি পদ্মজা উপন্যাসটি অনেক বছর আগের সমাজ নিয়ে। তখন গুরুজনদের সালাম করা ছিল বাধ্যতামূলক। শিক্ষার গুণ,ভদ্রতা! সেই সমাজের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে বার বার পা ছুঁয়ে সালাম করার দৃশ্য দিতে হচ্ছে। এমনকি বর্তমানেও এই রীতি আছে। আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না। ধন্যবাদ।

Kobitor.com

আমি পদ্মজা - ৪৯

পড়ন্ত বিকেলের শীতল বাতাসে শরীর কাঁটা দিচ্ছে। পদ্মজা শাল গায়ে জড়িয়ে নেয়। নিচতলায় এসে ফরিনার ঘরে যায়। ফরিনা কাঁথা সেলাই করছিলেন। পদ্মজাকে দেখে দুই পা ভাঁজ করে বসলেন। বললেন,'তুমি আইছো!'

পদ্মজা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,'জি আম্মা। কাঁথা সেলাই করছিলেন নাকি। আমি সাহায্য করি?'

'না,না তুমি এইসব পারবা না। সুঁই লাগব হাতে।'

'কিছু হবে না আম্মা। প্রতিদিনই সেলাই করা হয়।'

ফরিনা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,'তুমি কাঁথা সিলাও?'

পদ্মজা হেসে বলল,'ওই একটু।'

'কেরে? আমরা থাকতে তুমি সিলাও কেরে? তোমার সৎ আম্মায় তো নকশিকাঁথা সিলায়। হে থাকতে তোমার সিলাই করা লাগে কেরে?'

পদ্মজা ফরিনার হাত থেকে সুঁই টেনে নিয়ে বলল,'আব্বা মারা যাওয়ার পর দুই বছর আমি কেমন অবস্থা ছিলাম জানেনই তো। সে অবস্থায় আমার পক্ষে আমার পরিবারের জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। তখন উনি(বাসন্তী) পর হয়েও,সৎ মা হয়েও নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব তুলে নিলেন। কিন্তু উনি যতটুকু করতেন ততটুকুতে পরিবার চলতে গিয়ে হিমশিম খেতো। তাই আমিও চেষ্টা করেছি একটু যদি নকশিকাঁথার পরিমাণটা বাড়ানো যায়।' পদ্মজার ফুলের পাপড়ির মতো ফোলা ফোলা দুটি ঠোঁটে অল্প হাসি। সেই হাসিতে পরমা সুন্দরীর মুখমন্ডল অল্প আভায় আলোকিত। ফরিনা অবাক হয়ে সেই হাসি দেখেন। মন দিয়ে কাঁথায় ফুল তুলছে পদ্মজা। দাঁত দিয়ে সুতা কেটে ফরিনার দিকে তাকাল সে। পদ্মজার নিখুঁত চোখ-নাক। ফরিনা তাকিয়েই আছেন। পদ্মজা ডাকল,'আম্মা?'

ফরিনার সম্বিৎ ফিরল। তিনি প্রশ্ন করলেন,'তুমি নাকি শহরে কাম করো?'

পদ্মজা হাসল। বলল,'হুম,করা হয়। প্রেমা,প্রান্ত দুইজনই পড়াশোনা করে। পড়ালেখার কত খরচ! আর পূর্ণা তো পড়ালেখার চেয়ে বেশি খরচ করে ফেলে শাড়ি-অলংকার কিনতে গিয়ে। আম্মা নেই। বাধা দিতে কষ্ট হয়। আর উনি নিজের সব সঞ্চয় উজার করে দেন আমার তিন ভাই বোনকে। টাকা তো থাকে না। তাই চাকরি নিতে হলো। দুই বোনের বিয়ে দিতে হবে না? আমার তো ফরজ কাজ বাকি। তার জন্য টাকা জমাতে হচ্ছে। আর,উনার নকশিকাঁথার টাকার সাথে বেতনের কিছুটা অংশ মিলিয়ে পাঠিয়ে দেই। বেশ ভালোই চলছে। উনি আছেন বলেই আমার মাথার উপরের চাপটা কমেছে।'

'হ,বাসন্তী অনেক ভালা।আমি হের চেয়ে চার বছরের বড়। মেলা সম্মান করে আমারে। আচ্ছা,আমির তোমারে বাইরে কাম করতে দিছে?'

এ প্রশ্নে পদ্মজা কপাল চাপড়ে বলল,'আর বলবেন না আম্মা! কী যে যুদ্ধ করতে হয়েছে। শেষমেশ রাজি হয়েছেন। কিন্তু উনার অফিসে নাকি চাকরি করতে হবে। উনার অফিসে চাকরি নিলে উনি আমাকে কোনো কাজ করতে দিতেন? টাকা ঠিকই মাস শেষে দিতেন। ঘুরেফিরে, স্বামীর টাকায় বাপের বাড়ি খায় কথাটা আত্মসম্মানের সাথে লেগে যেত। এ নিয়ে তিনদিন আমাদের ঝগড়া ছিল। আলাদা থেকেছি,কেউ কারো সাথে কথা বলিনি।'

ফরিনা বেশ আগ্রহ পাচ্ছেন। উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন,'এরপরে কী হইলো? কাম করতে দিছে কেমনে?'

'এরপর... তিন দিন পর এসে বলল,চাকরি পেয়েছে একটা। ছয় ঘন্টা কাজ। হিসাব রক্ষকের পদ। বেতন ভালো। জানেন আম্মা,আমি ভীষণ অবাক হয়েছি! এতো কম সময়ের চাকরি আবার বেতনও তুলনায় বেশি। এরপর জানতে পারি,উনার পরিচিত একজনের অফিসে চাকরি বন্দোবস্ত উনিই করেছেন। উনি চান না আমি বেশি সময় বাইরে থাকি। আবার জেদ ধরেও বসে ছিলাম। এভাবেই সব ঠিক হয়। ইনশাআল্লাহ আম্মা,পূর্ণার বিয়েটা ধুমধামে হয়ে যাবে। প্রেমার তো দেরি আছে। অনেক পড়বে ও।'

ফরিনা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর বললেন,'আল্লাহ হাজার বছর বাঁচায়া রাখুক।'

'আম্মা,রুম্পা ভাবি কী তিন তলায়?'

'হ।'

'আজ দেখতে যাব ভাবছি। চাবি কার কাছে?'

ফরিনা মুখ গুমট করে বললেন,'হেই ঘরে যাওনের দরকার নাই। রিদওয়ান চাবি দিব না। ওরা আর আমারারে দাম দেয় না। যেমনে ইচ্ছা চলে।'

'দিবে না মানে কী? আপনি গুরুজন আপনাকে দিতে বাধ্য।'

'চাইছিলাম একবার,যা ইচ্ছা কইয়া দিছে।' ফরিনার মুখে আধার নেমে আসে। তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার বললেন,'চাবি চাওনের লাইগগা রিদওয়ান হের আম্মারেও মারছে।'

পদ্মজার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়,'সেকী! মায়ের গায়ে হাত তুলছে?'

ফরিনা কাঁথা সেলাই করতে করতে বললেন,'নিজের মা আর কই থাইকা! এই ছেড়ার মাথা খারাপ। অমানুষ।'

'বাড়ির অন্যরা কিছু বলেনি?'

'অন্যরা কারা?'

'আব্বা,চাচা,বড় ভাই কেউ কিছু বলেনি?'

'বাকিদের কথা জানি না। তোমার শ্বশুর তো নিজেই শকুনের বাচ্চা।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। ফরিনাও চকিতে চোখ তুলে তাকান। তিনি মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। দুজন দুজনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পদ্মজা প্রশ্ন করার আগে ফরিনা বললেন,'পূর্ণায় গাছে উঠছে। সকালে আছাড়ড়া খাইল বিকেল অইতেই গাছে উইট্টা গেছে। ছেড়িডারে কয়ডা মাইর দিও।'

পদ্মজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে,তার শ্বাশুড়ি আগের কথাটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। সে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারল না। মৃদু কণ্ঠে বলল,'আমি আসি আম্মা।'

'যাও।'

পদ্মজা দরজা অবধি এসে ফিরে তাকাল। ফরিনা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। পদ্মজা ঘর ছাড়তেই তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পদ্মজা উদাসীন হয়ে হাঁটছে। ফরিনা কেন নিজের স্বামীকে শকুনের বাচ্চা বললেন? পদ্মজা দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। এখন এসব ভাবা যাবে না। রিদওয়ানের কাছ থেকে চাবি নিতে হবে। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে রিদওয়ানের ঘরের সামনে আসে। দরজায় শব্দ করতেই ওপাশ থেকে রিদওয়ানের কণ্ঠ ভেসে আসে,'কে?'

পদ্মজা জবাব না দিয়ে,আরো জোরে শব্দ করল। রিদওয়ান কপাল কুঁচকে দরজা খুলল। পদ্মজাকে দেখে কপালের ভাঁজ মিলিয়ে যায়। ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। মোটা হয়েছে আগের চেয়ে। গালভর্তি ঘন দাঁড়ি। এক দুটো চুল পেকেছে। সে খুশিতে গদগদ হয়ে বলল,'আরে বাপরে,পদ্মজা আমার দুয়ারে এসেছে!'

পদ্মজা সোজাসুজি বলল,'রুম্পা ভাবির ঘরের চাবি দিন।'

রিদওয়ান দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। বলল,'এতদিন পর এসেছো আবার আমার ঘরের সামনে। ভেতরে আসো,বসো। এরপর কথা বলি।'

'আমি আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি। দয়া করে চাবিটা দিন।'

'চাবি তো দেব না।'

'কী সমস্যা?'

রিদওয়ান পদ্মজার কাঁধে হাত রেখে বলল,'আরে,ঘরে আসো তো আগে।'

পদ্মজা এক ঝটকায় রিদওয়ানের হাত সরিয়ে দিল। চোখ গরম করে তাকিয়ে বলল,'চাবি দিন।'

'চোখ দিয়ে তো আগুন ঝরছে। কিন্তু আমি তো ভয় পাচ্ছি না। চাবি আমি দেব না।'

'দেবেন না?'

রিদওয়ান আড়মোড়া ভেঙে আয়েশি ভঙ্গিতে বলল,' না।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। চলে গেল। রিদওয়ান পিছু ডেকেছে। সে শুনেনি। মগাকে দিয়ে পাথর নিয়ে তিন তলায় আসে। মদন একটা ঘরের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে ছিল। পদ্মজা বুঝতে পারে,তাহলে এই ঘরেই রুম্পা আছে। সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই মদন বলল,'কিছু দরকার ভাবি?'

Kobitor.com

পদ্মজা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল,'তালা ভাঙব। মগা,তালা ভাঙ।'

মদন দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে,'রিদওয়ান ভাইয়ের কাছে চাবি আছে। তার কাছ থাইকা লইয়া আসেন। তালা ভাইঙেন না।'

'উনি আমাকে চাবি দেননি। তাই আমি তালা ভাঙব। আপনি সরে দাঁড়ান।'

'না ভাবি,এইডা হয় না। আমার উপরে এই ঘরডার ভার দিছে ।'

'আপনি সরে দাঁড়ান।' পদ্মজা কথাটা বেশ জোরেই বলল। মদন হাওলাদার বাড়ির বউয়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পাচ্ছে না। সে দৌড়ে নিচে যায়। বাড়ির সবাইকে গিয়ে বলে পদ্মজা তালা ভাঙছে।

খলিল,আলমগীর, আমির,রিদওয়ান,ফরিনা,আমিনা ছুটে আসেন। ততক্ষণে পদ্মজা তালা ভেঙে ফেলেছে। আমির হন্তদন্ত হয়ে এসেই প্রশ্ন করল,'তালা ভাঙলে কেন?'

'আপনার ভাই আমাকে চাবি দেননি। আমার রুম্পা ভাবির সাথে দেখা করার ইচ্ছে হচ্ছিল তাই ভেঙেছি।'

'এইডা অসভ্যতা। তোমারে ভালা ভাবছিলাম। ছেড়ি মানুষের এতো তেজ, অবাধ্যতা ভালা না।'

পদ্মজা এক নজর খলিলকে দেখল। এরপর রুম্পার ঘরে ঢুকল। রুম্পা ঘরের মাঝে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লম্বা চুল এখন ঘাড় অবধি! কে কেটে দিয়েছে? যেন চুল না ময়লা ঝাড়ু। পদ্মজা দৌড়ে রুম্পার পাশে এসে বসে। রুম্পার শাড়ি ঠিক করে দিয়ে ডাকল,'ভাবি? ভাবি? শুনছো ভাবি? '

রুম্পার সাড়া নেই। গলায়,হাতে,পায়ে মারের দাগ। ফরিনা দেখে চমকে যান। রুম্পার এক হাত চেপে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন,'কেলায় মারছে বউডারে? আল্লাহ গো,কেমনে মারছে। রক্ত শুকায়া পাথথর হইয়া গেছে। এর লাইগগা আমরারে রুম্পার কাছে আইতে দেও না তোমরা? বউডা তোমরারে কী করছে? পাগল মানুষ।' ফরিনা বাড়ির পুরুষদের দিকে চেয়ে কেঁদে বললেন।

আমিনা দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বরাবরই অন্যরকম মানুষ। অহংকারী, হিংসুক। অন্যদের ভালো দেখতে পারেন না। রানির জীবনটা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আরো বেশি খামখেয়ালি হয়ে উঠেছেন। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল,'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? অন্যরা পাষাণ। আপনি তো পাষাণ না। ভাবিকে বিছানায় তুলে দিন।'

পদ্মজার কথায় আমির রুম্পাকে কোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমির, ফরিনা ছাড়া বাকি সবাই বিরক্তিতে কপাল ভাঁজ করে চলে যায়। তারা অসন্তুষ্ট। খলিল যাওয়ার আগে বিড়বিড় করে পদ্মজাকে অনেক কিছু বললেন। পদ্মজা সেসব কানে নেয়নি। সে শুধু অবাক হয়। মানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা হয়। সে রুম্পার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে। আমিরকে বলে,কবিরাজ নিয়ে আসতে। আমির চলে যায়। ফরিনার কাছ থেকে পদ্মজা জানতে পারল,তিনি দুই বছর পর রুম্পাকে দেখছেন! কী অবাক কান্ড! কখন চুল কাটা

Kobitor.com

হয়েছে জানেন না। পদ্মজা জানতে চাইল,'কেন এতো ভয় পান বাড়ির পুরুষদের? একটু শক্ত করে কথা বলে ভাবিকে দেখতে আসতে পারলেন না? ভাবির মা বাপের বাড়ি কোথায়? উনারা মেয়ের খোঁজ নেন না?'

'রুম্পার মা বাপ নাই। ভাই আছে দুইডা। ভাইগুলা আগেই খোঁজ নিত না। পাগল হুনার পর থাইকা নামও নেয় নাই।'

'মানুষ এতো স্বার্থপর কী করে হয় আম্মা?'

ফরিনা রুম্পার শাড়ির ময়লা ঝেড়ে দেন। ঘরদোর পরিষ্কার করেন। রুম্পার জ্ঞান ফিরে। কিন্তু কথা বলার শক্তিটুকু নেই। সে ড্যাবড্যাব করে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন পদ্মজার জন্য অপেক্ষায় ছিল। পদ্মজার জন্যই বেঁচে আছে! কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কতদিন ধরে তাকে পানি ছাড়া কিছু দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষুধার চোটে বালি খেয়েছে। ঘরের এক কোণে বালির বস্তা রাখা। পেট খারাপ হয়ে পুরো ঘর নষ্ট করেছে। বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গতকাল থেকে সে অজ্ঞান। তবুও কেউ এসে দেখেনি। পদ্মজার চোখের জল আপনাআপনি পড়ছে। রুম্পার কষ্ট তাকে দুমড়েমুচড়ে দিচ্ছে। সে মনে মনে শপথ করে,রুম্পাকে নিয়ে যাবে শহরে। ফরিনা ও পদ্মজা মিলে রুম্পাকে গোসল করাল। এরপর নতুন শাড়ি পরিয়ে,গরম গরম ভাত খাওয়াল। চুলে তেল দিয়ে দিল। খাওয়া শেষে রুম্পা বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। শরীরের শক্তিটুকু আসতে সময় লাগবে। একটু ঘুমালেই হতো। পদ্মজা রুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,'ঘুমাও ভাবি।'

রুম্পার দূর্বল দুটি হাত পদ্মজার হাত শক্ত করে ধরতে চাইছে। পদ্মজা টের পেল। সে রুম্পার দুই হাত শক্ত করে ধরে বলল,'তোমাকে ছেড়ে যাব না। থাকব আমি।'

রুম্পার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা মুছে দিল। ফরিনাকে বলল,'আম্মা আমি আমার ঘর থেকে আমার কোরআান শরীফ আর জায়নামাজ নিয়ে আসি। আর উনাকে বলে আসি আপাতত আমি রুম্পা ভাবির সাথে থাকব।'

'যাও তুমি। আমি এইহানে আছি।'

পদ্মজা বেরিয়ে গেল। বারান্দা পেরোবার সময় আলগ ঘরের সামনের উঠানে চোখে পড়ল। সেখানে পূর্ণা,রানি বাচ্চাদের নিয়ে গোল্লাছুট খেলছে। পূর্ণার পরনে শাড়ি! মেয়েটা এতো দস্যি হলো কী করে? সে চোখ সরিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল। সন্ধ্যার আযান পড়ার বেশি দেরি নেই।

রানি এক দলের নেতা,পূর্ণা অন্য দলের। দুই দলের নাম শাপলা আর গোলাপ। প্রতি দলে ছয়জন করে। বাচ্চাগুলোর বয়স ৯-১০ এরকম।

আলো আলগ ঘরের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে। মৃদুল আলগ ঘর থেকে বেরিয়ে বলল,'এই বাচ্চারা আমিও খেলতাম।'

রানি বলল,'না,না। তোরে নিতাম না।'

পূর্ণা মৃদুলকে দেখেই অন্যদিকে চাইল। তার ভীষণ লজ্জা করছে,মৃদুলের সামনে পড়তে! মৃদুল আরেকটু এগিয়ে এসে বলল,'ডরাইতাছোস? ডরানিরই কথা। এই মৃদুলের সাথে কেউ পারে না। আর তুই তো মুটকি। কেমনে পারবি?'

'আমি তোর চার মাসের বড়। সম্মান দিয়া কথা ক। মাঝখান থাইকা সর। খেলতে দে।'

'ধুর,তোর ছেড়ির এখন খেলার সময়। আর তুই খেলতাছস। সর। এই এই,বোয়াল মাছ। তোমার দলের একটারে বাদ দিয়া আমারে লও। এই মুটকিরে একশোটা গোল্লা না দিলে আমি বাপের ব্যাঠা না।'

পূর্ণা হা করে তাকায়। তাকে বোয়াল মাছ ডাকা হচ্ছে! এজন্য তার দিকে তাকিয়ে বাচ্চারাও হাসছে! দেখতে চকচকে সুন্দর হয়ে গেছে বলে কী,যা ইচ্ছে ডাকার অধিকার বাঘিনী পূর্ণা দিয়ে দিবে? কখনো না। সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল,'আমাকে আপনার কোন দিক দিয়ে বোয়াল মাছ মনে হচ্ছে?'

পূর্ণাকে কথা বলতে দেখে মৃদুল হাসল। রসিকতা করে বলল,'আরে কালি বেয়াইন দেখি কথা কইতেও পারে।'

পূর্ণা আহত হলো। এক হাতে নিজের গাল ছুঁয়ে ভাবল,সে কী কালি ডাকার মতো কালো? বাঘিনী রূপটা মুহূর্তে নিভে গেল। তার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। যাকে পছন্দ করলো,সে-ই কালি বলছে। পূর্ণা থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। রানি বলল,'মৃদুইললে সর কইতাছি। খেলতে দে।'

'আমিও খেলাম। এই আন্ডা তুই বাদ। তোর বদলে আমি বেয়াইনের দলের হয়ে খেলাম।'

মৃদুলের এক কথায় ন্যাড়া মাথার ছেলেটি সরে দাঁড়ায়। মৃদুল খেলার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল। এরপর পূর্ণাকে বলল,'কালি বেয়াইন তুমি আগে যাইবা? নাকি আমি আগে যামু?'

পূর্ণা মিনমিনিয়ে বলল,'আমি খেলব না।'

রানি দূর থেকে বলল,'দেখছস মৃদুইললা তুই খেলার মাঝে ঢুকছস বইললা পূর্ণা খেলত না। সবসময় কেন খেলা নষ্ট কইরা দেস তুই?'

মৃদুল সেসব কথায় ভ্রুক্ষেপও করল না। সে রসিকতার স্বরেই বলল,'আরে বেয়াইনের শক্তি ফুরায়া গেছে। আর খেলতে পারব না। এই আন্ডা তুই আয়। বেয়াইন খেলব না। তুই আইজ হারবিরে আপা।'

রানি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল,'আমার দলই জিতব।'

'আগে আগে চাপা মারিস না। আমার মতো দেখায়া দে। এই পেটওয়ালা তুই আগে যা।'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পূর্ণা ব্যথিত মন নিয়ে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের পথে পা রাখে। সে কালো সে জানে! কিন্তু কেউ কালি বললে তার খুব খারাপ লাগে। আল্লাহ কেন তাকে সৌন্দর্য দিলেন না? একটু ফর্সা করে দিলে কী হতো? তার আপার মতো কালো রঙে সবাই সৌন্দর্য কেন খোঁজে পায় না? পূর্ণা দুই হাত দিয়ে দুই চোখের জল মুছে। অভিমানী মন থেমে থেমে কাঁদছে। এই শাড়ি তো মৃদুলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই পরেছিল সে। দরকার নেই এই চকচকে পুরুষ। কেউ তাকে কালি বললে সে ভীষণ রাগ করে! ভীষণ।

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

[

]

আমি পদ্মজা - ৫০

____

সুনসান নিরবতা চারিদিকে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পদ্মজা

তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে কখন রুম্পা চোখ খুলবে। বিভোর হয়ে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। দরজায় কেউ টোকা দিতেই পদ্মজা সাবধান হয়ে গেল। রুম্পার নিরাপত্তা নিয়ে তার মন অস্থির হয়ে আছে। সে গম্ভীরকণ্ঠে জানতে চাইল,'কে কে ওখানে?'

'আমি।'

আমিরের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। এরপর দরজা খুলল। আমিরের চুল এলোমেলো। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে পদ্মজাকে দেখে বলল,'ঘুম ভেঙে গেল। তোমাকে মনে পড়ছে।'

'আমি তো এখন যেতে পারব না।'

'আমি থাকি তাহলে।' আমিরের নির্বিকার কণ্ঠ।

পদ্মজা চোখ রাঙিয়ে বলল,'শীতের রাতে মাটিতে থাকবেন? রুম্পা ভাবি বিছানায় ঘুমাচ্ছে। এই ঘরে থাকলে মাটিতেই থাকতে হবে। ঘরে যান।'

'মাটিতেই থাকব।'

'ধুর! আপনি সবসময় ঘাড়ত্যাড়ামি করেন। আপনাকে তো আমি বলে এসেছি কতোটা দরকার রুম্পা ভাবির সাথে থাকা।'

'গত দিনও বোনদের সাথে ছিলে। আজ রুম্পা ভাবির সাথে।'

'কয়টা দিনই তো। আজীবন একসাথেই থাকব।'

'আচ্ছা যাচ্ছি,এখনও ঘুমাওনি কেন?'

পদ্মজা একবার রুম্পাকে দেখে নিয়ে বলল,'এইতো ঘুমাব।'

আমির চারপাশ দেখে বলল,'আর,সাবধানে থাকবে। রিদওয়ান দোতলায় ঘুরঘুর করছে। ভয় পাবে না। আমি আছি।'

পদ্মজা চিন্তিত আমিরের চোখের দিকে তাকাল। বলল,'আপনি আমার সাথে থাকতে নয়,দেখতে আসছেন আমি ঠিক আছি নাকি তাই না? ভয় পাবেন না তো একদম।'

আমির দুই হাতে পদ্মজার দুই গাল ধরল,'আমি তো জানি আমার পদ্মবতী কতোটা সাহসী! এজন্যই এই বাড়িতে আসার সাহস করতে পেরেছি।'

'আহ্লাদ হয়েছে? এবার যান।'

আমির হেসে চলে গেল। পদ্মজা অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় তাকিয়ে রইল। এরপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমিরকে সে কতোটা ভালোবাসে সে নিজেও জানে না! আমিরের প্রতিটি স্পর্শ,কথায় ছন্দে হৃদয় স্পন্দিত হয়। আমিরের পাগলামি,খেয়াল রাখা,দায়িত্ববোধ সবকিছু পদ্মজাকে মুগ্ধ করে। একজন আদর্শ স্বামী বোধহয় একেই বলে। আমিরের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়ল। ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে ভাবা সময়টা জাদুর মতো। চোখের পলকে নির্ঘুম রাত কেটে যায় নয়তো নিজের অজান্তে আবেশে ঘুম চলে আসে।

সকালে উঠেই পূর্ণাকে গিয়ে ডেকে তুলল পদ্মজা। এরপর রুম্পার ঘরে এসে নামায পড়ল। কোরআান পড়ল। রুম্পার ঘুম আরো কিছুক্ষণ পর ভাঙে। রুম্পাকে ধরে ধরে টয়লেটে নিয়ে যায় পদ্মজা। এরপর রুম্পাকে রেখে রান্নাঘর থেকে খাবার আনতে যায়। ফরিনা মাত্র চুলা থেকে খিচুড়ি নামিয়েছেন।

'আম্মা,ভাবির জন্য খিচুড়ি নিয়ে যাই?' বলল পদ্মজা।

ফরিনা হেসে বললেন,'এইডা আবার কওন লাগে। লইয়া যাও। তুমি খাইবা কুনসময়?'

'ভাবিকে খাইয়ে এসে তারপর উনাকে নিয়ে খাব। আম্মা,রাতের হাঁসের মাংস আছে না?'

'হ আছে তো। ওইযে ওই পাতিলডায়।'

পদ্মজা গরম গরম খিচুড়ি হাঁসের মাংসের ভুনা দিয়ে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকে দেখল,রুম্পা মেঝেতে পড়ে আছে। পদ্মজা থালা বিছানার উপর রেখে রুম্পাকে তোলার চেষ্টা করে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,'ভাবি মেঝেতে পড়লেন কীভাবে?'

রুম্পা কিছু বলছে না। সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছটফট করছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পদ্মজাকে দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। পদ্মজা খুব বিস্মিত। রুম্পা এমন করছে কেন? সে রুম্পাকে প্রশ্ন করেই চলেছে,'কেউ এসেছিল ঘরে? কে এসেছিল? ভয় দেখিয়েছে? ভাবি...ভাবি বলো আমাকে। ভাবি...ধাক্কাচ্ছো কেন? আমি তোমার জন্য খাবার এনেছি।'

খাবারের কথা শুনে রুম্পা থমকে গেল। পদ্মজার দিকে এক নজর তাকিয়ে বিছানার দিকে তাকাল। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের উপর। এতো গরম খাবার গাপুসগুপুস করে খেতে থাকল। পদ্মজা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এমনভাবে রুম্পা খাচ্ছে যেন আর কোনোদিন খাওয়া হবে না। সুযোগ আসবে না। পদ্মজা পানি এগিয়ে দিল। রুম্পা অল্প সময়ের ব্যবধানে পুরো থালার খিচুড়ি এবং এক বাটি হাঁসের মাংস ভুনা খেল।

খাওয়া শেষে পদ্মজা নমনীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করল,'ভাবি আমার সাথে একটু কথা বলবেন?'

রুম্পা দূরে সরে যায়। দেয়াল ঘেঁষে বসে। মাথা দুইদিকে নাড়িয়ে ইশারা করে,সে কথা বলবে না। পদ্মজা তবুও আশা ছাড়ল না। সে রুম্পার পাশে গিয়ে বসল। রুম্পার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আমি তোমাকে আমার সাথে ঢাকা নিয়ে যাব। যাবে?'

রুম্পা এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। পদ্মজাকে ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে বলল,'বাইর হ আমার ঘর থাইকা। বাইর হ তুই।'

রুম্পার ব্যবহারে পদ্মজা আহত হলো,'ভাবিই! আমি তোমার ভালো চাই।'

'বাইর হ কইতাছি। বাইর হ।'

শীতের ঠান্ডা হিম বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকছে। শীতের দাপট বেড়েছে। এবারের শীত বোধহয় মানুষ মারার জন্য এসেছে! এতো ঠান্ডা! রুম্পার পরনে শাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। ঠান্ডায় তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। পদ্মজা রুম্পার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করল। রুম্পার চোখ বার বার দরজার দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল না অবধি, ছুটে আসে দরজার কাছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুক ছুটে পালাতে চায়। পদ্মজা জোরালো কণ্ঠে ডেকে উঠল,'লতিফা বুবু।'

লতিফা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পদ্মজাকে দেখল। এরপর সিঁড়িভেঙে নিচে নেমে যায়। তার চোখে ভয় ছিল। একটা ঝনঝন শব্দ হয়। পদ্মজা চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। রুম্পা পাগলামি শুরু করেছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ছে। পদ্মজা রুম্পাকে থামানোর চেষ্টা করে। অনেক বোঝায়। কিছুতেই রুম্পা থামে না। রুম্পার হাত থেকে স্টিলের গ্লাস পদ্মজার কপালে এসে পড়ে। পদ্মজা 'আহ' বলে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রুম্পা পাগলামি থামিয়ে দিল। ছুটে এসে পদ্মজার আহত স্থানে হাত রাখে, উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে,'আমি তোমারে ইচ্ছা কইরা দুঃখ দেই নাই বইন। বেশি বেদনা করতাছে?'

আঞ্চলিক ভাষায় রিনঝিনে কণ্ঠ! পদ্মজা দুই চোখ মেলে তাকায়। রুম্পা পদ্মজার কপালের ফোলা অংশে ফু দিচ্ছে। সে ভীষণ অস্থির হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে,পদ্মজাকে অনেক পছন্দ করে রুম্পা। মুখোশ খুলে বেরিয়ে এসেছে আসল রূপে। সে কঠিন নয়,পাগল নয়। বরং বড্ড নরম,কোমল। পদ্মজা শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল,'কেন পাগলের অভিনয় কর ভাবি?'

রুম্পার হাত থেমে যায়। সে ধরা পড়ে গেছে।

____

কুয়াশার স্তর ভেদ করে একটা নৌকা খালে ঢুকে। নৌকা চালাচ্ছে মৃদুল। গতকাল যে ছেলেটাকে মৃদুল আন্ডা ডেকেছিল সেই ছেলেটাও নৌকায় আছে। তার ভালো নাম,জাকির। মৃদুলের সাথে বাচ্চাকাচ্চাদের অনেক খাতির। পূর্ণা খালের ঘাটে বসে ছিল। সে ফজরের নামায পড়ে,খিচুরি খেয়ে এখানে চলে এসেছে। মন খারাপের সময় ঘাটে বসে থাকতে তার ভালো লাগে। গতকাল রাতে খাওয়ার সময় মৃদুল কম হলেও বিশ বার তাকে কালি ডেকেছে। অন্ধকারে নাকি দেখাই যায় না। এমন অনেক কথা বলেছে। কালো রঙের মেয়ে হওয়া বোধহয় পাপ! আবার পদ্মজাও রাতে তার সাথে থাকেনি। পুরো রাত সে কেঁদেছে। কেউ কেন তাকে কালি বলবে! আবার তার আপাও তাকে সময় দিল না। শ্বশুরবাড়ির অন্য বউকে নিয়ে ব্যস্ত। পূর্ণার খুব অভিমান হয়েছে। বয়স বিশ পার হলেও রয়ে গেছে সেই ছোট্ট কিশোরী মেয়েটি। মৃদুল নৌকা থামিয়ে পূর্ণাকে ডাকল,'কালি বেয়াইন।'

পূর্ণা তাকাল না। মৃদুল আবার ডাকল,'বেয়াইন গো।'

তাও পূর্ণা সাড়া দিল না। মৃদুল জাকিরকে বলল,'কী রে ব্যাঠা, বুঝছিস কিছু? এই ছেড়িরে ভূতে ধরল নাকি?'

জাকির দাঁত বের করে শুধু হাসল। মৃদুল জোরে বলল,'আরে বেয়াইন কী কানে শুনে না? কাল তো ঠিকই শুনছিল। ঠান্ডা কী কানের ভেতরে ঢুইকা গেছে? ও কালি বেয়াইন। বেয়াইন...'

পূর্ণা হুট করে উঠে দাঁড়াল। আঙুল শাসিয়ে মৃদুলকে বলল,'আপনার কী মা বাপ নাই? থাকলেও শিক্ষা দেয়নি যারে তারে যা ইচ্ছে ডাকা উচিত না। অসভ্যতা অন্য জায়গায় করবেন আমার সামনে না। আমি কালো আমি জানি। আপনাকে কালি বলে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি আপনাকে অনুমতি দেইনি আমাকে কালি ডাকতে বা বেয়াইন ডাকতে। আমি আপনার বেয়াইনও না। আমার ধুলাভাইয়ের আপন ভাই না আপনি। কোথাকার কে আপনি? এই ফর্সা চামড়ার দেমাগ দেখান? আরেকবার আমাকে কালি বললে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।'

কথা শেষ করেই পূর্ণা কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যায়। রেখে যায় অপমানে থমথম করা একটা মুখ। মৃদুল ঘোর থেকে বেরোতে পারছে না। তাকে একটা মেয়ে এভাবে বলেছে? তার মতো সুন্দর ছেলের জন্য গ্রামের

সবকটি মেয়ে পাগল। আর এই কালো মেয়েটা তাকে এভাবে অপমান করলো! মৃদুল রাগে বৈঠা ছুঁড়ে ফেলে খালে। নৌকা থেকে রাগে নামতে গেলে তার এক পায়ে নৌকা ধাক্কা খেল। ফলে নিমিষে দূরে চলে যায় নৌকাটি। নৌকায় থাকা ছেলেটি চিৎকার করল,' মৃদুল ভাই। আমি আইয়াম কেমনে? বৈডাডাও ফালায়া দিছো।'

মৃদুল বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকাল। সত্যি নৌকা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এই ঠান্ডার মধ্যে ছোট বাচ্চাটা সাঁতরে পাড়ে আসবে কীভাবে!

মৃদুল রাগ এক পাশে রেখে বরফের মতো ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দিল।

রুম্পা থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা অনবরত প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে ভীষণ অস্থির। একজোড়া পায়ের শব্দ ভেসে আসতেই রুম্পার কান্না থেমে গেলে। যেন এই পায়ের শব্দগুলো সে চিনে। রুম্পা কাঁপতে থাকল। রুম্পার অবস্থা দেখে পদ্মজার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত গড়িয়ে যায়। রুম্পা পদ্মজার এক হাত ধরে চাপাস্বরে দ্রুত বলল,'এহান থাইকা চইলা যাও বইন। আর আগাইয়ো না। ওরা পিশাচের মতো। ছিঁইড়া খাইয়া ফেলব। ওদের দয়ামায়া নাই। তুমি অনেক ভালা। তোমারে কোনোদিন ভুলতাম না আমি। তুমি এইহানে থাইকো না। তুমি এই বাড়ির কেউয়ের লগে যোগাযোগ রাইখো না।'

'ওরা কী করেছে? ভাবি, অনুরোধ করছি আমাকে বলুন। ভাবি অনুরোধ করছি।'

রুম্পা সেকেন্ডে সেকেন্ডে ঢোক গিলছে। পায়ের শব্দটা যত কাছে আসছে তার কাঁপুনি তত বাড়ছে। সে ছলছল চোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে কোনোমতে বলল,'পিছনে...উত্তরে...ধ রক্ত।'

পরমুহূর্তেই দরজা ঠেলে রুমে ঢুকে খলিল হাওলাদার। এতো জোরে দরজা ধাক্কা দিয়েছেন যে, বিকট শব্দ হয়। হুংকার ছেড়ে পদ্মজাকে বললেন,'তুমি এই ঘর থাইকা বাইর হও। অনেক অবাধ্যতা দেখাইছো আর না।'

খলিলের চোখ দুটি দেখে পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। গাঢ় লাল। সে দুই হাতে রুম্পাকে জড়িয়ে ধরে বলল,'আমি রুম্পা ভাবির সাথে থাকব।'

'থাকবা না তুমি।'

'কেন জানতে পারি?'

'একটা পাগলের সাথে কীসের থাকন?'

'রুম্পা ভাবি পা...' পদ্মজা কথা শেষ করতে পারল না। বুকে মুখ লুকিয়ে রাখা রুম্পা পিঠে চিমটি দিয়ে ভেজাকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল,'কইও না। আমি পাগল না কইও না। দোহাই লাগে।'

পদ্মজা থেমে গেল। খলিল বললেন,'বাড়ায়া যাও বউ।'

পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে বলল,'যাব না আমি। রুম্পা ভাবির সাথে থাকব আমি।'

রুম্পা পদ্মজাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার পাগলামি শুরু করে। খলিল রুম্পাকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হতেই পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল,'নিজের মেয়েকে অমানুষের মারতে পারেন বলে সবার মেয়েকে মারার অধিকার পাবেন না।'

পদ্মজার কথা মাটিতে পড়ার আগে খলিলের শক্ত হাতের থাপ্পড় পদ্মজার গালে পড়ে। পদ্মজা ব্যথায় 'মা' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

[

Kobitor.com